

প্রতীচী | the west



শারদীয় - ২০১৭

BENGALI ASSOCIATION OF GREATER ATLANTA

Dear BAGA members, friends and family,

I welcome you all to our biggest festival of joy, the Sharadiya Durga Puja, beginning with the Mahalaya on September 23, followed by three days of Puja on September 29, 30 and October 1. Durga Puja is not only a traditional religious celebration which tugs at the heart strings of Bengalees everywhere, it is also the time when we immerse ourselves in a cultural fest and enjoy a culinary feast. We hope that all of you will enjoy every moment of the days we planned for you. I am sure, all of us are looking forward to the religious and cultural programs, meals served on each day of festivity and the shopping opportunities at the puja venue. May Ma Durga bestow her blessings upon you all!

This year, our cultural programs during the puja will showcase our local talents and the invited guest artists, Anupam Roy (September 29), Surojit O Bondhura (September 30) and accomplished singers Soumen & Bristilekha (October 1). We have also invited reputed vendors to present attractive merchandise at the venue for your shopping pleasure. We beseech you all to patronize them generously.

To briefly summarize our past events, during our Saraswati Puja, BAGA launched the BAGABeatZ, a band of talented young musicians along with other children performances. The Ananda Utsav program celebrated the spring and was held on May 20. It was an all-day event for families and friends with the taste of the Bengali cuisine, the shops of specialty saris and designer jewelry, and an entire day of mega-cultural productions. A special magazine Ankur honoring the great men of the past of Bengal was published on this occasion. Special thanks to publication and cultural committee and to the children for their arts & poems and articles. Our Picnic on June 10 at Fort Yargo State Park was a rousing success with about hundred people attending. We are also pleased to report that the momentum of increasing BAGA membership is continuing with about 30 new members joining during this period.

BAGA screened the critically acclaimed Bengali movie Zulfiqar on 28th January followed by a “Meet and Greet: Q & A” with award-winning director Srijit Mukherjee. BAGA also screened the Bengali hit movie Posto at Digimax Theate on 26th August allowing members to watch it on big screen. For the entertainment of BAGA sports fans, we have planned a Cricket match on 28th October for the first time. Please attend in drove and provide encouragement to the players.

I like to express my appreciation and extend my sincere thanks to the members of EC for their unflinching support, the cultural coordinators, food coordinators, and decoration committees, all subcommittees and countless volunteers for their dedication, diligent work and tireless devotion to their areas of responsibility. I owe a debt of gratitude to the parents of our child participants for the endless hours they spent for rehearsal, costume design and stage setup.

My sincere thanks to the BAGA members who secured advertisements in the tough environment to make the publication possible. We are also grateful to all the advertisers, vendors and the generous donors named in BAGA 2017 List of Donors. We apologize if we left any name inadvertently.

I must acknowledge the dedication of the Publication committee for their tireless efforts and for the countless hours spent to publish Pratichi. We are grateful for art, poem and articles submitted, especially from the children. They are our future hope and asset.



Joy Bhattacharjee
President

সম্পাদকীয়

রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘সঙ্গীতচিন্তা’ গ্রন্থে একটি অপূর্ব উপমার উল্লেখ করেছেন।

“গ্রামে হুণ্ডায় একদিন হাট বসে। বৎসরে একবার মেলা হয়। মানুষের ইতিহাসেও তেমনই এক একটা যুগে হাটের দিন আসে। সেদিন যে যার আপন আপন সামগ্রী বুড়িতে করিয়া আনিয়া, পরের সামগ্রী সংগ্রহ করিতে আসে। সেদিন মানুষ বুঝিতে পারে, একমাত্র নিজের উৎপন্ন জিনিষে মানুষের দৈন্য দূর হয় না। বুঝিতে পারে, নিজের ঐশ্বর্যের একমাত্র সার্থকতা এই, যে তাহাতে পরের ঐশ্বর্য পাইবার অধিকার জন্মায়”।

যদিও তিনি সঙ্গীতচিন্তা প্রসঙ্গে এটি লিখেছেন, তবুও বলি, আজ তাঁর এই উপমা অতি উল্লেখযোগ্য এবং সময়োপযোগী। বাঙালির এই বাৎসরিক বৃহত্তম ‘মেলায়’ আজ আমরা সমবেত। কিন্তু এই মেলার মূল উদ্দেশ্য যদি অনুধাবন করে দেখি, সমাজ বিবর্তনের সাথে সাথে এই গভীর উদ্দেশ্যকে কিন্তু আর কাল অপহরণ করে নিতে পারে নি। পূজার রীতিনীতি ও লোকাচার যেন বিবর্তনের জালে বাঁধা। সময়ের সাথে তার পরিবর্তন আবশ্যিক এবং অপ্রতিরোধ্য। আজকের এই সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে পূজার আচারানুষ্ঠানের প্রয়োজন আছে কি নাই, সেই বিতর্কে না জড়ালেও, এটুকু গ্রহণ করতে দ্বিধা নাই যে পরের ঐশ্বর্যলাভের প্রত্যাশা থাকলে আমাদের নিজস্ব ঐশ্বর্য বিতরণের ইচ্ছাপোষণও আবশ্যিক। প্রতিনিয়ত সংবাদপত্র ও অন্যান্য মাধ্যমে আমরা যে সমস্ত হৃদয়বিদারক সংবাদে মুহামান হয়ে উঠি, তার একটি প্রধান কারণ বোধহয় ঐশ্বর্য বিনিময়ের ভারসাম্যের অভাব। নেবার আশা, অথচ দেবার অনিচ্ছা, এ হেন ‘আরও চাই’ প্রবৃত্তি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের নৈরাশ্যের বোধহয় এক প্রধান কারণ হয়ে উঠেছে।

কিন্তু আজকের এই দিনে দাঁড়িয়ে আমরা বুঝিতে পারি, যে সেই হাটের দিন আসিয়াছে, সেই মেলার দিন আসিয়াছে। আমাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্য সামগ্রী সাজাইয়া আমরা সমবেত। দেবীপক্ষে এই শুভ লগনে বাগা ডাক দিয়েছে এই বৃহৎ মেলার। সেই ঐশ্বর্য বিনিময়ের দিন আসিয়াছে। আমাদের বুড়ি তাই আজ কনায় কনায় পূর্ণ।

প্রতিবারের মত এবছরও বাগার পরিবেশনায় প্রকাশিত হ’ল আমাদের প্রিয় শারদীয় ‘প্রতীচী’। আশা করি প্রতিবারের মত এবারও এটি আপনাদের সবার মন জয় করে নেবে। তবে এই প্রকাশনার পেছনে যাদের অসামান্য অবদান রয়েছে, তাঁদের কথা না বললে তো চলে না। প্রথমেই উল্লেখ্য এডিটিং এর কাজ - অনিলদা (চক্রবর্তী) ও সৌমিত্র (চট্টোপাধ্যায়), এঁদের বিরামহীন খুঁতখুঁতে মনোযোগ ও রক্তিমদার (সেন) বিজ্ঞাপন ডিজাইন ছাড়া প্রতীচী হ’ত অসম্পূর্ণ। আর বিজ্ঞাপনের টাকা ছাড়া তো প্রতীচী অপ্রকাশিত। তাই অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাঁরা এই বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করেছেন তাদের কথা ভুলবেন না যেন। সমস্ত লেখক, লেখিকা ও চিত্রকরদের অবদানেই জন্ম নিয়েছে প্রতীচীর এই কলেবর। তাদের সবাইকে ধন্যবাদ। আর বাগার তরফ থেকে আপনাদের জন্য রইল শারদীয় শুভেচ্ছা ও ভালবাসা।

সঞ্জয় মাইতি

প্রতীচী | the west
শারদীয় ২০১৭

সম্পাদক / Editor

সঞ্জয় মাইতি / Sanjoy Maity

সহ-সম্পাদক / Co-editors

অনিল চক্রবর্তী / Anil Chakrabarti

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় / Soumitra Chattopadhyay

রক্তিম সেন / Raktim Sen

প্রচ্ছদ / Cover Design

সঞ্জয় মাইতি / Sanjoy Maity

অক্ষর বিন্যাস / Typesetting

সঞ্জয় মাইতি / Sanjoy Maity

অনিল চক্রবর্তী / Anil Chakrabarti

পরিকল্পনা ও রূপায়ন / Planning & Layout

সঞ্জয় মাইতি / Sanjoy Maity

দায়মোচন:

এই পত্রিকায় প্রকাশিত রচনা, বিজ্ঞাপনের দায়িত্ব ও মতামত সংশ্লিষ্ট রচনাকার এবং বিজ্ঞাপনদাতাদের। তজ্জনিত কোনো ক্ষয়ক্ষতির জন্য প্রকাশক বা সম্পাদকের দায়ী নন।

The views expressed in the writings that appear in this publication are the views of the respective authors and advertisers and not necessarily represent those of BAGA (Bengali Association of Greater Atlanta) committee or the publication's editor.

"The decoration committee works hard to provide a beautiful platform which help enhance our visual and spiritual senses and our appreciation of the beauty of the protima of Ma Durga and her entourage.

Beginning of this year we invited Ma Saraswati and placed her in midst of the tanpura, the musical instrument of her choice beautifully handcrafted by the talented members Subarna, Arpita, Anindya.

*Brace yourself to be spellbound by the beauty of the Gods and Goddesses arriving for her stay with us in a magnificent "Nauko" or ship. This will be made possible due to the hard work of our decoration committee: Subarna, Arpita, Bharath, Swapnali." - **Cultural Committee.***

‘কথায় বলে বাঙালি মানেই ভোজন রসিক। রসনা তৃপ্তি ছাড়া বাঙালির কোনো অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ হয় না। যারা বছরের পর বছর আমাদের এই কর্মযোগে নিঃস্বার্থ ভাবে সহযোগিতা করে চলেছেন, তাদের কাছে বাগা কৃতজ্ঞ। আপনাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে আমরা আপ্লভ। আগামী দিনেও আপনাদের এইরূপ সহযোগিতা আমাদের এই কর্মযজ্ঞের পাথেয় হয়ে দাঁড়াবে। আপনাদের পরিবারের সকলকে শারদ উৎসবের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই। ভালো থাকুন এবং এই ভাবেই আমাদের পাশে থাকুন।’ - **Food Committee.**



Lahari Das
(Vice President)



Subhadra Gupta
(Vice President)



Soma Dey
(Vice President)



Mamata Paul
(Vice President)



Kishore Chakraborty
(Vice President)



Chaitali Nath
(Treasurer)

Donation

Bandyopadhyay Apala & Surajit	Gupta Subhadra
Banerjee Mita & Partho	Karanjee Somesh & Mousumi
Banerjee Ayan & Kasturi	Kateswari Rajiv & Gayatri
Basu Kaushik & Pragnaparamita	Kundu Sudeep & Rani
Basu Pradip K & Mala	Majumdar Subroto & Debjani
Bhattacharjee Joy & Mausumi	Majumder Parimal & Dimpal
Bhaumik Dharmajyoti	Mitra Anshu & Babita
Bose Dulalendu & Mukti	Modi Girish
Bose Sujit & Nita	Mondal Umashankar & Shukla
Chakrabarti Anil & Parnika	Mukherjee Reshmi & Subhankar
Chakraborty Kishore & Gargi	Nath Chaitali & Subhankar
Chakraborty Dilip & Anuradha	Pandit Arko & Maumita
Chakraborty Rina & Amitavo	Paul Shantanu & Debarati
Chakravorty Hari	Paul Mridul & Mamata
Chowdhury Arindam & Joyshree	Paul Piyasa Molly
Das Bijan & Sumita	Rakshit Ananda & Ria
Das Rita	Roy Chaudhuri Amiya & Srimita
Das Lahari & Amit	Roy Apurba & Krishna
De Soma & Dibyendu	Roy Surojit & Sabari
Deb Avro & Jayita	Roy Dipankar & Chandrima
Debsikdar Jagadish & Nupurchhanda	Rudra Suman
Deka Ganesh & Parul	Samaddar Amartya & Sharbani Samaddar
Dey Achintya	Sarker Ashoke & Moitri
Dhar Arup & Sheuly	Sau Tarun & Pratima
Dutta Chandan & Papiya	Sen Raktim & Munmun
Dutta Sumit & Krishnakali	Sengupta Shankar & Ruma
Ghosh Soumen	Talukdar Baren & Geetanjali
Ghosh Shukharanjan & Malini	Talukder Nirnjan & Kasturi
Goswami Manas & Anuva	Tapaswi Arindam & Nabanita
Gupta Kiriti & Shanta	Williams Poul & Reshma Gupta

Puja Team

Banerjee Gouri	De Soma
Banerjee Shailendra (Priest)	Goswami Anuva
Basu Mala	Gupta Shanta
Chakrabarti Anil (Priest)	Purakayastha Debjani
Chakraborty Parnika	Roy Chandra
Chakraborty Sucheta	
Das Lahari	

Volunteer

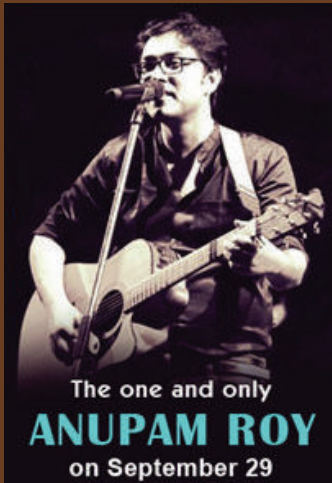
Banerjee Ayan	De Dibyendu	Majumder Dimple
Banerjee Kasturi	De Soma	Majumder Parimal
Banerjee Mita	De Sritama	Minal Majumdar
Banerjee Nabanita	Deb Jayita	Mondal Sukla
Banerjee Partha	Debnath Pranati	Mondal Umashankar
Banerjee Saswati	Dey Soma	Mukherjee Parth
Baruah Bharat	Dhar Arup	Mukherjee Partho
Baruah Subalita	Dhar Seuly	Mukherjee Reshmi
Barua Suparna	Dhrubo Dhar	Mukherjee Saswati
Basu Deepti	Dimple Majumdar	Nath Shuvankar
Basu Kaushik	Dutta Chandan	Paul Mridul
Basu Mala	Dutta Debarati	Paul Shantanu
Basu Mallika	Dutta Krishnakali	Poddar Satindra
Basu Mausumi	Dutta Moumita	Purkayastha Debjani
Basu Pragna	Dutta Papiya	Rabindra Chakraborty
Basu Ruchira	Dutta Pranabesh	Rakhit Ananda
Basu Sharmistha	Dutta Sumit	Rakhit Ria
Beterbet Ranjita	Dutta Tanushree	Ray Choudhuri Srimita
Bhaumik Dharmajyoti	Ghosh Malini	Ray Chandrima
Bhowal Indira	Ghosh Soma	Roy Deblina
Bose Maitrayee	Goswami Anuva	Roy Dipankar
Bose Nita	Goswami Sumana	Roy Sabari
Bose Sujit	Guha Debasree	Roy Sudipta
Chakrabarti Anil	Guin Angshuman	Rudra Damayanti
Chakraborty Gargi	Guin Jayashree	Rudra Suman
Chakraborty Amitabha	Gupta Arpit	Samaddar Sarbani
Chanda Subarna	Gupta Arpita	Sarker Moitri
Chandra Bhaswati	Gupta Kiriti	Sarker Sangeeta
Chatterjee Devi	Gupta Shanta	Sarker Ashoke
Chatterjee Manas	Hazra Abhijit	Sarker Moitri
Chowdhury Joyshree	Kar Kalayni	Sen Apala
Chowdhury Arijit	Karanjee Mousumi	Sen Munmun
Das Lahari	Kundu Rani	Sengupta Ruma
Das Papiya	Kundu Sudeep	Sengupta Shankar
Das Rita	Maity Mahua	Talukdar Runa
Das Swapnali	Majumdar Anirban	Talukder Kasturi
Dasgupta Ghosh Paromita	Majumder Anirban	



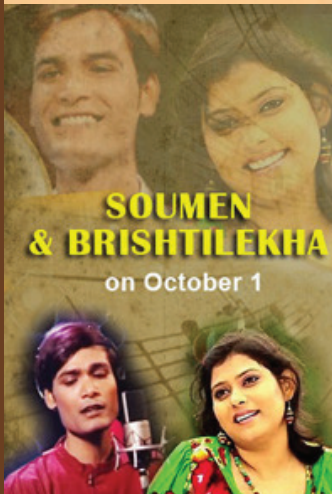
Durga Puja 2017 Cultural Program

For the Durga Puja we tried to bring to you sensational programs by our local talents as well as renowned guest artists from Kolkata. We hope that all of you will enjoy the programs and like to thank you for celebrating this festive season with us.

GUEST ARTISTS



on September 30



BAGA ORIGINAL PRODUCTIONS



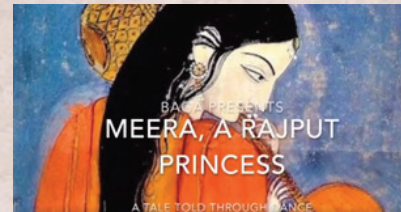
A musical production by the talented singers of BAGA
- Directed by Dr. Raktim Sen



A stage production by BAGA kids

Concept: Mausumi Basu

Directors: Mausumi Basu, Arindam Chowdhury, Neha Banerjee, Apala Sen, Moumita Dutta, Reshmi Mukherjee, Rikha Saha, Mahua Maity, and Sarbani Samaddar



A timeless story of a Rajput princess, from the magnificence of a palace to the austerity of a hermitage
- Directed by Ria Rakhit



A different kind of Ramayana addressing the gaps in Valmiki's original plot and touching on social issues
- Directed by Shankar Sengupta



Artwork by: *Deepika Banerjee*



মানিকচাঁদের বিয়ে

পরশর শর্মা

জমিদার গিন্নী জরুরি তলব পাঠালেন সদরে জমিদার বাবুকে দেখা করার জন্য। জমিদার বাবু প্রমাদ গুনলেন।

আজকে সন্ধ্যাবেলায় বেনারস থেকে আসা নতুন বাইজির মজলিসে যাবার কথা। জমিদার গিন্নীকে উপেক্ষা করার মত সাহস জমিদার বাবুর নেই। কারণ বিয়ের সময় জমিদার গিন্নীর বাবার থেকে দশটা গ্রাম যৌতুক হিসাবে নিয়ে ছিলেন। সুতরাং সদর ছেড়ে হস্তদস্ত হয়ে অন্দরের দিকে পা বাড়ালেন।

গিন্নী কি হয়েছে? হঠাৎ জরুরি তলব?

কি হয়েছে? সংসারের দিকে মন আছে? না ঐ বাইজি বাড়ি আর রাড়ের বাড়ি নিয়ে পড়ে থাকলেই হবে।

কি যে বল, গিন্নী। এতবড় জমিদারিটা তো চালাচ্ছি।

সব বুঝেছি। ছেলের বিয়ে দাও।

বল কি? এই তো বয়েসটা পঁচিশ হল।

পঁচিশ নয়। আটশ।

তা না হয় বুঝলাম। হঠাৎ বিয়ে?

তোমার মানিকচাঁদের অনেক গুণ হয়েছে।

তার মানে?

এ বাড়ি ও বাড়ি যাওয়া শুরু করেছে। এখন আবার একটা বাঁধা বাড়িও হয়েছে। একজনকে পাকাপাকি রেখেছে।

নাম কদলিবালা দাসী।

বল কি। এ গুণটা তো শুধু আমারই ছিল।

শুধু তোমার নয়। তোমার বাবারও ছিল। ছিলনা শুধু আমার বাবার।

ঠিক আছে, ঠিক আছে। আবার স্বর্গীয় লোকেদের নিয়ে টানাটানি কেন?

আমি কোন কথা শুনতে চাই না। ছেলের বিয়ের বন্দোবস্ত কর।

হবে, গিন্নী হবে। তুমি যখন বলছ, তখন হবেই হবে।

যত তাড়াতাড়ি পার, কর।

সে আর বলতে।

জমিদার বাবু সদরের দিকে পা বাড়ালেন। যাক বাবা, বাঁচা গেল। সন্কেটা মাটি হল না।

সদরে এসে নায়েব মশাইকে ডেকে পাঠালেন। হাত
কচলাতে কচলাতে নায়েব বটকেষ্ট বাবু এলেন।

হুজুর আমায় ডেকেছেন?

হাঁ নায়েব মশাই কথা আছে। মানিকের বিয়ের বন্দোবস্ত
করুন।

বলেন কি হুজুর? বয়েস তো কিছুই হয় নি।

জমিদার বাবু নায়েব মশাইয়ের কানটা মুখের কাছে টেনে
ফিসফিস করে বললেন।

আমি এখনই বন্দোবস্ত করছি হুজুর।

নায়েব মশাই পরদিনেই নবা ঘটক নিয়ে জমিদার বাড়িতে
হাজির।

নবা ছেলের জন্য একটা পাত্রী দেখ।

কি রকম পাত্রী হুজুর?

জমিদারের ছেলের কি রকম পাত্রী লাগবে বলে দিতে হবে?

নবা কান ধরে জিভ কাটল।

পাত্রী সুন্দর দেখতে হবে। ভালো বংশের হবে। গান আর
লেখাপড়া জানবে আর রান্নাবান্না একটু আধটু জানলেই
হবে। জমিদার বাড়িতে তো রান্নাবান্না করার লোকের অভাব
নেই। মনে রেখ এটা আমার হুকুম নয় তোমাদের জমিদার
মায়ের হুকুম। দশদিন সময় দিলাম। যাও কাজে লেগে পড়।
কাজটা যদি করতে পার ভাল ঘটক বিদায় পাবে।

ভাল ঘটক বিদায় চাই না হুজুর। আপনার কাছে যে বিঘে
খানেক জমি বন্ধক আছে সেটা ফেরত পেলেই হবে।

ঠিক আছে কাজটা তো আগে কর।

নবা ঘটক কথা রাখল। সাতদিনের মাথায় পাত্রী ঠিক।
জমিদার আর জমিদার গিন্নীর পাত্রী খুবই পছন্দ।

একেবারে মনের মত পাত্রী। এমনটাই চেয়ে ছিল। দিন
পনেরোর মধ্যেই মানিকচাঁদের বিয়ে হয়ে গেল।

জমিদার বাড়ির চত্তরে বিশাল শামিয়ানা খাটিয়ে বিয়ে বাড়ি।
এলাহি কাণ্ড। ফুলশয্যার রাত। খাওয়া দাওয়া চলছে। রাত
দশটা নাগাদ মানিকচাঁদের ইয়ার বন্ধুরা দেখল মানিক চাঁদ
হাতে একটা বেলফুলের মালা জড়িয়ে এদিক ওদিক দেখে
বাড়ির বাইরের দিকে যাচ্ছে। ইয়ার বন্ধুরা জানে মানিকচাঁদ
কোথায় যাচ্ছে।

আরে তুই যাচ্ছিস, কোথায়? আজ তোর ফুলশয্যা। নতুন
বৌ তোর জন্য অপেক্ষা করছে। আর তুই কিনা কদলিবালা
বাড়ি যাচ্ছিস? মনে রাখিস তোর বাবা এই একটা দিন
তোর মায়ের সঙ্গে কাটিয়ে ছিল, তাই তোদের বংশটা রক্ষা
পেয়েছে। আজ যদি তুই কদলিবালায় কাছে যাস তোর
বংশটা রক্ষা করবে কে?

ইয়ার বন্ধুদের কথা মানিকচাঁদের মনে ধরল। পায়ে পায়ে
নতুন বৌ এর ঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

বন্ধুরা হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

ফুলশয্যার ঘরের দরজটা আস্তে আস্তে খুলে দেখল নতুন
বৌ বেনারসি গহনা আর ফুলের মালা পরে পালঙ্কের এক
কোনে দাঁড়িয়ে আছে। পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে রোজকার
অভ্যাস মত হাতে জড়ানো বেলফুলের মালাটা নতুন বৌ
এর গলায় পরিয়ে দিয়ে পকেট থেকে একটা একশ টাকার
নোট বার করে নতুন বৌ এর হাতে দিল। নতুন বৌ চটপট
নোটটা দেখে নিয়ে পাশে রাখা ব্যাগটা খুলে নোটটা রেখে
পঞ্চাশ টাকা বার করে মানিক চাঁদের হাতে দিল।

মানিক চাঁদ বলল পঞ্চাশ টাকা ফেরত দিলে কেন?

জমিদার বাড়িতে বিয়ে হয়েছে বলে রাতারাতি রেটটা তো
বাড়াতে পারি না।

নতুন বৌ এর চটপট উত্তর।



দাবিয়ান ভ্যালি

গণেশ ঢোল (সুরাট, ইন্ডিয়া)



সে সময় আমরা প্রায়ই খেয়ে টেয়ে থাকতাম। মানে? মানে আর কী, ঐ একটু নেশা করতাম। পাখি নতুন উড়তে শিখলে যা হয়। সব সময়েই ফুরুং ফুরুং। তেমনি আমরাও গুড়ুক গুড়ুক। সিগারেটের মশলা বার করে হাসের গুলিগুলোকে সেফটিপিনে ফুটিয়ে, দেশলাইয়ের আগুনে পুড়িয়ে, ঐ মশলার সাথে মিশিয়ে সুখটান। না সুখটান নয়, কথাটা হবে দুখটান। তখন সবসময়েই মনটা খারাপ লাগত। কেননা মেয়েরা পান্ডা দেয় না, স্যারেরা নম্বর দেয় না, পকেটে পয়সা থাকে না - সে এক বিতর্কিত অবস্থা। তার ওপর ১৯৮৪ সালের ৩১শে অক্টোবর ইন্দিরা গান্ধী মারা গেলেন। সেদিনই কাঞ্চনের বাবারও মৃত্যু সংবাদ এল। তখন শিখ নিধন শুরু হয়ে গেছে। মল্লিক ফটকে আগুন জ্বলছে। কলকাতার অবস্থাও খুব খারাপ। এরই মধ্যে আমরা কয়েকজন এসপ্ল্যান্ডে পৌঁছলাম হেঁটে, ছুটে, বাসে। যখন যেমন তখন তেমন। কাঞ্চনকে বেলঘরিয়ার বাসে তুলে আমরা ফিরে এসেছি হাওড়া স্টেশনে। যে যার বাড়ি চলে যাব। আমার সঙ্গে পিঠে ঝোলান ব্যাগে দুএকটা জামা-কাপড়, ব্রাশ-পেস্ট, সস্তার কোডাক ক্যামেরা আর কয়েকদিন আগেই পাওয়া স্কলারশিপের বেশ কিছু টাকা। কিন্তু হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে দেখি খড়গপুর যাওয়ার কোনো ট্রেনই চলছে না। সে সময় হঠাৎই প্ল্যাটফর্মে তেরঙ্গা ঝান্ডা নিয়ে ইন্দিরা গান্ধী অমর রহে, এশিয়ার মুক্তিসূর্য ইন্দিরা গান্ধী জিন্দাবাদ - করতে করতে প্রচুর কংগ্রেসের ছেলে, সারা স্টেশন ছেয়ে গেল।



তখন দিল্লির উদ্দেশে রাজধানী এক্সপ্রেস ছাড়ছিল। ওরা হুড়োহুড়ি করতে করতে সেই ট্রেনে উঠল। পেছন, পেছন আমিও। ব্যস ধাঁই কিরি কিরি ট্রেন চলতে লাগল। সারা ট্রেন প্রায় ফাঁকা। বৈধ প্যাসেঞ্জারদের প্রায় কেউই আসতে পারেনি। তাই আমাদের মোচ্ছব। ট্রেনে অপরিাপ্ত খাবার। কোচ অ্যাটেন্ড্যান্ট, টিটি এবং রেলের অন্য কর্মচারীরা আমাদেরই ভয় পাচ্ছে। অবশ্য আমাদের ভয় পাওয়ার কোনও কারণই ছিল না। ওরা দলটাকে, মানে অসংঘটিত জনতাকে, ভয় পাচ্ছিল। যাইহোক, ট্রেন আমাদের পরদিন পৌঁছে দিল নিউ দিল্লি স্টেশনে। দিল্লিতে নেমে তো দিশেহারা অবস্থা। যানবাহন প্রায় কিছুই চলছে না, দোকানপাট বন্ধ, চারিদিকে একটা দমবন্ধ অবস্থা, রাস্তায় পুলিশ, মিলিটারি ঘুরে বেড়াচ্ছে। যাদের সাথে এসেছি তাদেরকেও চিনি না। ট্রেনে একটু বন্ধুত্ব করার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু ভালো লাগেনি। তাদের শিক্ষা, দীক্ষা, সংস্কার অনেকটাই আলাদা। ঘোরের মধ্যে ট্রেনে চড়ে গিয়েছিলাম, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তা ছেড়েও দিয়েছিল। আগুপিছু ভাবার সময় হয়নি। কিন্তু দিল্লিতে এসে আমার বেশ ভয় লাগছিল। তাই আমি ঐ দলের সাথে না ঘুরে একটা সাইকেল রিক্সায় চেপে পৌঁছে গেলাম ওল্ড দিল্লি স্টেশনে। সেখানে তখন হাওড়া ফেরৎ যাওয়ার কোনো ট্রেন নেই। শালিমার এক্সপ্রেস ছাড়ছিল, তাতেই উঠে পড়লাম। সে ট্রেন পরদিন ভোরে পৌঁছে দিল জম্মু তাওয়াই স্টেশনে। বেশ ঠান্ডা অথচ শীতের কোনো জামাকাপড় নেই। খুব কষ্ট হচ্ছিল। এদিকে জম্মুতেও দারুণ গোলমাল। স্টেশন থেকে

হাঁটতে হাঁটতে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের দিকে গেছি। ঠেলায় চা বিক্রি হচ্ছিল। দাঁড়িয়ে সেই চা খাচ্ছি, এমন সময় আমার কাঁধে বিরাট এক থাবা পড়ে। আমি পেছন ঘুরে দেখি ইন্ডিয়ান আর্মির ক্যামোফ্লেজ ইউনিফর্ম পরা এক বিরাট চেহারার লোক বড় বড় দাঁত বের করে আমায় জিঙেস করছে, কীরে গোবিন্দ এখানে কী করছিস? মুখটা চেনা চেনা লাগে, কিন্তু গোবিন্দ বলতে কাকে বোঝাচ্ছে কে জানে! হঠাৎ মনে হয়, আরে এতো শিবানন্দ, আমাদের সাথে স্কুলে পড়ত। ক্লাস টুয়েলভের পরে আর পড়েনি। আর্মিতে জয়েন করেছিল। তখনই চেহারা বেশ যণ্ডামার্ক ছিল, এখন আরও খোলতাই হয়েছে। ওর সেই আধমণি হাতকে সরিয়ে বলি, মাকড়া, তুমি গৌতমকে গোবিন্দ বানিয়ে ছেড়ে দিয়েছো। ওর কোনও বিকার হয় না। তবু ওকে সংক্ষেপে আমার অবস্থা বিবৃত করি। ও খুব মন দিয়ে শোনে তারপর বলে, এখানে এখন বেশ গোলমাল। আমরা পহেলগাম যাচ্ছি, তুইও চা। আমার রাজি না হওয়ার কোনো কারণ ছিল না। তাছাড়া আমি তখন জানতামও না যে পহেলগাম কাশ্মীরে। ভেবেছিলাম কাছেই কোনো গ্রাম হবে। যাইহোক ওদের সাথেই ট্রাকে করে রওনা হই। সে ট্রাক যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। পাহাড়ি রাস্তা ঘুরে ঘুরে কখনও ওপরে উঠছে, কখনও নীচে নামছে। ট্রাকটার ছাদ সবুজ ত্রিপল দিয়ে ঢাকা। বসার জন্য দুদিকে বেঞ্চ। ঠিকমতো ধরার জায়গা নেই। আমি বারবারই উল্টে পড়ছি অন্য ফৌজিদের গায়ে। গা গুলিয়ে উঠছে। শিবানন্দকে বললাম, আর পারছি না। ও তখন আমায় একদম ধারে নিয়ে গিয়ে বসাল। আমার জামার কলারটা শক্ত করে পেছন থেকে ধরে থাকল। গাড়ি পাকদণ্ডী বেয়ে চলেছে। আমিও মাথা বার করে বমি করে চলেছি। তিন-চার বার বমি করার পর শরীরটা বেশ অবসন্ন আর হালকা হয়ে গেল। ট্রাক এসে দাঁড়াল উধমপুরে। আমার তখন আবার ঐসব খেতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু ঐ মিলিটারিদের সামনে ঠিক সাহস পাচ্ছিলাম না। যতই হোক, ব্যাপারটা তো ইললিগাল। যখন তখন পুলিশে হ্যান্ডওভার করে নার্কোটিক কেস দিয়ে দিতে পারে। নেশার বস্তুগুলো বার করে শিবাকে দেখাতেই আমাকে এই মারে তো সেই মারে। বলে, তুই আমার চাকরি খাবি? এখন একদম উল্টোপাল্টা করবি না। আমাদের পৌঁছতে রাত হয়ে যাবে, ক্যাম্পে পৌঁছে তোকে রাম খাওয়াব। আমি ওকে খেঁকিয়ে বললাম, সিগারেট তো খাওয়া যাবে নাকি? ও বলল, সিগারেটে গাঁজার মশলা পোরা থাকলে নয়। আমার তখন সসেমিরা অবস্থা। ট্রাকের

চাকা সারানো হচ্ছিল, আমি সেই ফাঁকে নেমে দেখি একটা চায়ের দোকানে গোল হয়ে বেশ কিছু লোক হুঁকো খাচ্ছে। আমিও বসে গেলাম ওদের সাথে, পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বার করে রাখলাম ওদের মাঝে। ওরাও খুব খুশি। জিঙেস করলাম, ইসমে কিয়া হ্যায়? ওরা বলল, গোলি হ্যায়, ফুটুস হ্যায়। হুঁকোর ঐ নলে বেশ কয়েকবার টান দেওয়ার পর শরীরটা বেশ ঝরঝরে আর মনটা ফুরফুরে হয়ে গেল। আমি ওদের পিঠ টিঠ চাপড়ে সামনের দোকান থেকে সস্তার গরম চাদর, কানঢাকা টুপি, একটা জ্যাকেট আর একজোড়া দস্তানা কিনলাম। সেগুলো পরে আবার চললাম জোয়ান মদ্দের সাথে। এবার আর আমার মধ্যে কোনো জড়তা নেই, শরীরও চাঙ্গা। রাস্তায় নানারকম আদিরসাত্মক (খুব মোটা দাগের) চুটকি শুনতে হচ্ছিল। হাসি না পেলেও হাসতে হচ্ছিল। তারা শুরু করল নতুন বর্ণপরিচয় — ক-এ কবিতাদি, খ-এ খগেনের, গ-এ গদিতে বসিয়া, ঘ-এ ঘষাঘষি করে। ঙ-য় ওঁয়া ওঁয়া, আহা ওঁয়া ওঁয়া। এরকম চলতে থাকে। এটা শেষ হলে শুরু হয় কীর্তন ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গের সুরে - সকালে উঠিয়া কানু খিঁচিয়া ধরিয়া — (এরপরের লাইনগুলো খুবই অশ্লীল)। গানের মাঝে মাঝেই একজন দোহার ধরে, সখী ন্যাকড়া দে না, মুছিবার তরে ন্যাকড়া দে না। এই করতে করতে রাস্তার দুপাশের নয়নাভিরাম দৃশ্য বাদ পড়তে লাগল। একে তো ঐ ঢাকা ট্রাকের দুধারে কোনো জানলা নেই, শুধু যেদিক দিয়ে চড়তে হবে সেদিকটাই খোলা। তারপর সেই অশ্লীল গান চোখ দুটোকে ঠিক নিজের কাজ করতে দিচ্ছিল না। সন্ধে হয়ে গেল, পৌঁছলাম সেনা ছাউনিতে। কিন্তু রাতে সেখানে থাকতে দিল না আমায়। শিবা আমার ব্যাগে ভরে দিল ওল্ড মস্কের একটা বোতল আর বলে দিল মামলেশ্বর মন্দিরের ঠিকানা। আবার হাঁটছি চড়াই উতরাই। বেশ কষ্ট হচ্ছে, হাঁফ ধরে যাচ্ছে। সে মন্দিরে পৌঁছে দেখি তার দরজা বন্ধ, এক বিরাট লম্বা চওড়া লোক কন্ডলকে চাদরের মতো করে গায়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমি তাঁকে প্রণাম করে তাঁর পায়ে কাছ পঞ্চাশ টাকা রেখে বললাম, দুদিন থাকব। তিনি কোনো কথা না বলে মন্দিরের পেছনে ওনার এক কামরার ঘর, থাকার জায়গা দেখিয়ে দিলেন। আমি সেখানে ঢুকতে যাব, উনি আমার পায়ের দিকে আঙুল দেখালেন। আমি জুতো খুলে সেই ঘরে ঢুকে দেখি খুবই সাদামাটা ঘর। এককোণে মোটা দুটো কন্ডল ভাঁজ করে রাখা আছে। হিন্দিতে শিবের স্তোত্রমালা জাতীয় দুটো চটি বই, একটা

ঝুড়িতে অনেকগুলো আপেল আর আখরোট রাখা, একটা দড়িতে সামান্য জামা কাপড়, গামছা ঝোলানো। আমার শরীর আর নিচ্ছিল না। একটা কাঠের বেশ বড় পিঁড়ি ছিল, তাড়াতাড়ি তার ওপর বাবু হয়ে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে পড়লাম। কিছুক্ষণ পর উনি এসে আমায় ঐ ঘরের বাইরে একটা চৌবাচ্চা দেখিয়ে বললেন হাত মুখ ধুয়ে আসতে। আমার একটুও ইচ্ছে করছিল না ঐ ঠান্ডায় জল ঘাঁটাঘাঁটি করতে। কিন্তু যদি বার করে দেয় - এই ভয়ে উঠলাম। সেই বরফের মতো জলে হাত দিতে না দিতেই দাঁতে খটাখটি লেগে গেল। কোনোরকমে হাত পা ধুয়ে আবার সৈঁধিয়ে গেলাম সেই ঘরে। কাঁপুনি আর থামে না। আমি ব্যাগ থেকে রামের বোতলটা বার করে দেখলাম ওনাকে। উনি গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়লেন, অর্থাৎ চলবে না। আমি পকেট থেকে একটা দোমড়ান সিগারেট বার করলাম, উনি ওটা আমার হাত থেকে নিয়ে মৃদু হাসলেন। ফস করে দেশলাই জ্বালিয়ে সেটা তিন চার টানে শেষ করে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে হুঙ্কার দিলেন, ব্যোম ব্যোম মহাদেব, ভোলে বাবাকী জয়। তারপর বললেন, ম্যয় তুঝে অসলী চীজ পিলাতা হুঁ, অসলী মণিপুরী। আবার চিৎকার করে কাকে যেন ডাকলেন, গুল, গুল। ঐ চিৎকার শুনে গলা থেকে পা পর্যন্ত ঢাকা আলখাল্লা পরা একটা লোক হাজির হয়। তার আলখাল্লার হাতা দুটো লটপট করছে। বুঝতে পারি হাত ঢোকায়নি হাতার মধ্যে। পরে দেখেছিলাম বেশিরভাগ পুরুষ মানুষই ওরকম - তোশকের ওয়াড়ের মতো পোশাক পরে থাকে সারা শরীরে। ওগুলোকে ফিরান বলে। গুলের সাথে ঐ সাধুবাবা দুর্বোধ্য কাশ্মীরি ভাষায় কথা বলে। শুধু ছিলম শব্দটাই চেনা লাগে। কিছুক্ষণের মধ্যেই গুল গাঁজার কলকে, পরিষ্কার কাপড় এবং

ঐ অসলি মণিপুরী নিয়ে হাজির হয়। সাধুবাবা সেই কলকে মাথায় ঠেকিয়ে জয় বাবা ভোলেনাথ, জয় বাবা মামলেশ্বর বলে দুহাতের অপূর্ব মুদ্রায় বিশাল জোরে টান দেন। কলকের মুখে দপ করে আগুন জ্বলে ওঠে। তারপর একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে কৃতিত্বের চোখে আমার দিকে তাকিয়ে কলকে বাড়িয়ে দেন গুলের দিকে। আমি চমকে উঠে গুলের হাতের দিকে তাকিয়ে দেখি ডান হাতের কনুয়ের একটু নীচ থেকে বাকি হাতটা আর নেই। সেই ডান হাতের কনুয়ের খাঁজে অদ্ভুত কৌশলে কলকে ধরে মুখের কাছে নিয়ে টান দেয়। আমার গা শিরশির করে ওঠে। সেই কাটা হাত বাড়িয়ে দেয় আমার দিকে। আমি একটু সন্ত্রস্ত হয়েই ঐ কলকেতে চোখ বুজে টান দিই। মাথা ঝিমঝিম করে ওঠে। কলকে ঘুরতে থাকে হাতে হাতে। সাধুবাবা উঠে একটা শক্ত পেঁড়া জাতীয় মিষ্টি আমার হাতে দেন। আমি ধীরে ধীরে খেতে থাকি। অসম্ভব ভালো লাগে সেই মিষ্টি, ঐ পরিবেশ। মনে হয় একটা আবছা কুয়াশার চাদর যেন কেউ সারা গায়ে বিছিয়ে দিয়েছে। কিছুক্ষণ পরে গুল খুব ছোট দুটো কাচের গ্লাসে দুধের মতো হলুদ তরল নিয়ে আসে। একটা গ্লাস আমার হাতে দেয়, আমি জিঞ্জেস করি, ইয়ে কিয়া হয়্য, পীলা কিঁউ হয়্য? গুল গম্ভীর হয়ে উত্তর দেয়, দুধ মে কেশর ডালা হয়্য। আমি চিন্তা করি, কেশর! কেশর মানে কী? যাইহোক খাওয়ার জিনিসই হবে নিশ্চয়ই। আমার মনের কথা বুঝতে পারে। বলে, কেশর বহোৎ কীমতি চীজ হয়্য। এক গ্রাম কেশর পাঁচাশ রুপীয়া। আমার বিশ্বাস হয় না। সে রাতে আপেল, আখরোট আর মণিপুরী খেয়েই কাটে। পরদিন সকালে ঘুম ভাঙে সাধুজীর উদাত্ত কণ্ঠের মন্ত্র শুনে।

জয় গঙ্গাধর জয় হর জয় গিরীজাধীশ শিব জয় গৌরীনাথ

ত্বং মাং পালয় নিত্যং, ত্বং মাং রক্ষয় শম্ভু, কৃপয়া জগদীশ,

ওঁ হর হর হর মহাদেব॥

প্রায় দশ মিনিট ধরে চলতে থাকে এইরকম গান, শিবস্তোত্র। প্রতি দুলাইন শিবের নানারকম গুণগান তারপর ঐ ওঁ হর হর হর মহাদেব। খুব ভালো লাগে। তবু কন্মল জড়িয়ে শুয়ে থাকি। আবার কখন ঘুমিয়ে পড়ি। বেলা আটটা নাগাদ ঘুম থেকে উঠে দেখি কেউ কোথাও নেই। পুরো মন্দির প্রাঙ্গণ ফাঁকা। মন্দির বাইরে থেকে দরজা বন্ধ, ছিটকিনি লাগান।

তার মানে ভেতরেও কেউ নেই। দিনের বেলা ভালো করে চারপাশ দেখি, খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। মূল মন্দির একটু উঁচুতে, সিঁড়ি ভেঙে উঠতে হয়। মন্দিরের ভেতর পরিষ্কার মতো, তাতে স্বচ্ছ জল। চারপাশে বাগান, নানা রঙের মেলা। দূরে পাহাড়, তার গায়ে সেডার, পাইন, আরও নাম না জানা নানারকম গাছ। চারিদিক অদ্ভুত নিস্তব্ধ। আমি আমার পিঠে

ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। আবার হন্টন। খুব খিদে পায়। হাঁটতে হাঁটতে সেই আগের জায়গায় পৌঁছে যাই। সেখানে দিনের বেলায় দোকান-বাজার। ঘোড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে ফিরান পরা কাশ্মীরি লোক টুরিস্টদের সাথে দরাদরি করছে।

আমাকেও একজন পুরো পহেলগাম ঘুরিয়ে দেওয়ার অফার দেয় একশো টাকার বিনিময়ে। কেউ আখরোট, কেউ শাল, কেউ কেশর বেচতে চায়। সবাইকে না, না বলে একটা চায়ের দোকানে বসে কাশ্মীরি রুটি আর চা খাই। শরীরে একটু বল আসে। আবার হাঁটতে শুরু করি। ঐ যারা ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে তাদের পেছন পেছন হাঁটি। কিছুক্ষণ পরেই পাহাড়ি সন্ধীর্ণ উঁচু-নীচু রাস্তা শুরু হয়। অনভ্যস্ত সওয়ারিরা ভয়ে চিৎকার করে ওঠে। ঘোড়া খটখট করতে এগিয়ে চলে। অপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্য। ভূস্বর্গ! সত্যিই ভূস্বর্গ! ভগবান যেন সবটুকু উজাড় করে দিয়েছেন এখানে। নিজের চোখে না দেখলে, ছবি দেখে অথবা বর্ণনা পড়ে ঠিক বোঝা যাবে না কতটা সুন্দর। মনে হয় বাকি জীবন এখানেই থেকে যাই। ঘোড়াওয়ালা বিবরণ দেয় এখানে ববি সিনেমার শ্যুটিং হয়েছিল, জায়গার নাম দাবিয়ান ভ্যালি। সত্যি কিনা কে জানে! পাহাড়ের ওপর কিছুটা সমতল জায়গা। আমি বসে বসে হাঁফাতে থাকি। পিঠ থেকে ব্যাগটা নামিয়ে রেখে সিগারেট বার করে টান দিই। ঠান্ডা হাওয়া দেয়। হঠাৎ খুব শীত করে ওঠে। ভাবি এখন একটু রামের বোতলে চুমুক দিলে বেশ হয়। ব্যাগের মধ্যেই বোতলটা রাখা ছিল। ওটা বার করতে গিয়ে দেখি ব্যাগটাই নেই, একেবারে উধাও। আশে পাশে কাছে দূরে কোথাও নেই। ওর মধ্যেই আমার টাকা পয়সা সর্বস্ব ছিল। সঙ্গে প্যান্টের পকেটে সাকুল্যে একশো টাকাও নেই। চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে নানারকম লোক, স্ত্রীলোক, বাচ্চা - কাকে জিজ্ঞেস করব? নিজের বোকামিতে নিজেকেই খাবড়াতে ইচ্ছে করে। মাথার ভেতরটা কেমন হালকা লাগে। নিজেকে কেমন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর মতও মনে হয়। এখন আমার সাথে ঐ সাধুবাবার কোনো তফাৎ নেই। চুপচাপ বসে থাকি। সব হারিয়েও বিরাট কিছু মন খারাপ হয় না। শুধু চোখ নয় আমার সমস্ত শরীর সেই সৌন্দর্য্য শুষে নিতে থাকে। বসে থাকি, কখনও একটু হাঁটি, আবার বসে পড়ি ঘাসের ওপরে। হঠাৎ বাইশ তেইশ বছরের একটি মেয়ে ঘোড়ার পিঠে শালের বোঁচকা চাপিয়ে হাজির হয় আমার কাছে। শাল কেনার জন্যে জোরাজুরি করে। যতই না বলি ততই বলে যে আমার

জন্যে সস্তা করে দেবে। অগত্যা আসল কথা বলি যে ইচ্ছে থাকলেও আমি কিনতে পারব না। সর্বস্ব খোওয়া গেছে আমার। মেয়েটির মায়া হয়। তার কথায় শহুরে ভদ্রতা থাকে না। তাই তুমি, আপনি-র তোয়াক্কা না করেই জিজ্ঞেস করে, কী করবি এখন, বাড়ি ফিরবি কী করে? আমি বলি, জানি না। ও বলে, চল আমার বাড়িতে, কাশ্মীরি চা কাওহা খাওয়াব তোকে। চুপ করে থাকি ঐ পরিবেশে মেয়েটিকেও গাছ, পাথর, নদী, পাহাড়, জলের মতো প্রকৃতির অংশ মনে হয়। আমার সমস্যা নিয়ে তাকে বিব্রত করতে ইচ্ছে হয় না। বলি, আমার এক বন্ধু আছে এখানকার ফৌজিদের ছাউনিতে, তার কাছে ধার করব। তোমায় চিন্তা করতে হবে না। সে কথায় হঠাৎ রেগে ওঠে মেয়েটি। বলে, ফৌজিদের কথা আর একবারও বলবি না। ওরাই মেরেছে আমার বাপ-ভাইকে। ওদের জন্যেই আজ আমার এই অবস্থা। রোজ ঘুরে ঘুরে শাল বিক্রি করি। কেউ কিনতে চায় না। একই জিনিস দোকান থেকে বেশি দাম দিয়ে কেনে। মহাজনকে দিয়ে থুয়ে সারাদিন যা রোজগার হয় তাতে ঘোড়ার দানাও জোটে না। এই পর্যন্ত বলে হাঁফাতে থাকে মেয়েটি। নাকের পাটা ফুলে ওঠে রাগে। তারপর আবার বলে, কাউকে বলবি না - তুই যে ঘোড়া দুটোর পেছন পেছন এসেছিলি তাদের লোকেরাই নিয়ে গেছে তোর ব্যাগ। সেই ব্যাগ রাখা আছে আমাদের ঘরে। চল আমার সাথে, ফিরে পাবি তোর সবকিছু। তবে ঐ ফৌজিদের একদম বলবি না। ওরা জানলে গ্রামের সবার ওপর খুব অত্যাচার করবে। আমি হাঁ হয়ে যাই তার কথা শুনে। কিন্তু আমার তখন প্রাণটা ছাড়া আর কিছু হারানোর নেই। তাই উঠে দাঁড়াই। মেয়েটি ঘোড়ার পিঠে একটা চাপড় মেরে বলে, চড়ে বস এর ওপর। আমি অনেক কষ্টে পাদানিতে পা রেখে চড়ে যাই। জীবনে এই প্রথম ঘোড়ায় চড়া। নিজেকে বেশ বীর বীর লাগে। সে একটা ছোট্ট পাতলা ছড়ি দিয়ে ঘোড়ার পিঠে আঘাত করে আর মুখ দিয়ে অদ্ভুত একটা শব্দ, ব্রু-উ-উ-উ... করে। ঘোড়া চলতে থাকে। সেও চলতে থাকে পাশে পাশে। খুব সরু রাস্তা, শুধু ঘোড়ার পা রাখা যায় এই রকম তিন-চার ইঞ্চির পাথুরে খাঁজে খাঁজে পা দিয়ে ঘোড়া চলে। মনে হয় যদি একবার ঘোড়ার পা পিছলে যায় তাহলে আমিও ...। অবশ্য সেসব কিছু হয় না। উঁচুতে ওঠার সময় সে আমাকে নীচু হতে বলে, আমি শরীরটা ঘোড়ার পিঠের সাথে মিশিয়ে দিই। নীচে নামার সময় সে আমাকে পেছনে হেলতে বলে, আমিও বাধ্য ছেলের মতো তার নির্দেশ পালন করি। বেশ

কিছুক্ষণ চলার পর একটা সমতল জায়গা আসে। সেখানে ছাড়া ছাড়া মাটি, কাঠ, ঘাস-পাতার অতি দীন দরিদ্র বাড়ি। সামনে চোকো চোকো জমি। সেই জমিতে শুকনো মাটি, তাতে ছাড়া ছাড়া কিছু বেগুনি রঙের ফুল। মাটির সঙ্গে মিশে আছে কিছু শুকনো সবুজ পাতা। তবে ফুলগুলো প্রমিন্যান্ট। মনে হবে যেন ফুলের সাথে পাতার কোনো সম্পর্ক নেই। ফুলই গাছ, গাছই ফুল। মাটি থেকে দু তিন ইঞ্চি ওপরে ফুটে আছে ছয় পাপড়ির অহঙ্কারী ফুল। দু তিনটে লাল লম্বা কেশর বেরিয়ে আছে। জিপ্তেস করি, কী ফুল এগুলো? মেয়েটি খুব গর্বের সঙ্গে উত্তর দেয়, জাফরান, ইসসেই কেশর বনতা। দুনিয়া কি সবসে কিমতী ফুল।

— তোমার নাম কী?

— আলিয়া।

— পুরো নাম?

— আলিয়া, আলিয়া, আলিয়া। আলিয়া জাফরান - জাফরানি আলিয়া, বলে খিল খিল করে হাসতে থাকে সেই মেয়ে। হঠাৎই আমার সামনে এসে দাঁড়ায়। আমি কিছু বুঝে ওঠার আগেই দীর্ঘ চুম্বন করে। তারপর আমায় ছেড়ে দৌড়ে চলে যায় নিজের প্রায়াক্ষকার ঘরে। ঘোড়াটাও যায় তার পেছন পেছন। কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে এসে আমার হাতে সেই হারিয়ে যাওয়া ব্যাগ তুলে দিয়ে বলে, সবকিছু দেখে নে, ঠিকঠাক আছে কিনা। আর ঘোড়ার পিঠে চড়ে চলে যা আগের জায়গায়। এখানে দুজনকে একসঙ্গে দেখে নিলে তুই আর বাঁচবি না। আমাকেও কেটে রেখে দেবে। আমার কানে

যায় না ওকথা। আমি ব্যাগ থেকে ক্যামেরা বার করে তার ছবি তুলতে থাকি। সে তাড়া দেয়, ওঠ শিগগিরি ওঠ। আমি বলি, তাহলে নিয়ে এলি কেন?

আমার তখন মাথার ঠিক ছিল না। তুই যা, অন্য কোথাও আর একরাতও কাটাবি না। চলে যা তোর বন্ধুর কাছে।

সেখান থেকে নিজের দেশে, এই বলে জোরজোর করে চড়িয়ে দেয় আমায় ঘোড়ায়।

আমি বলি, তুইও চল।

এখান ছেড়ে আমাদের কোনও যাওয়ার জায়গা নেই। তুই পালা আর ভুলে যা সবকিছু। তুই চলে যা, বলে কেঁদে ফেলে মেয়েটি, ঘোড়ার পিঠে ছপটি দিয়ে আবার আঘাত করে আর মুখ দিয়ে সেই অভূতপূর্ব আওয়াজ - ব্র-উ-উ-উ ...

ঘোড়া চলতে শুরু করে দেয়। সে আমার পাশে চলতে চলতে বলে, আর কখনও আসবি না এখানে, কখনও না। মাটি থেকে একটা জাফরান ফুল তুলে গুঁজে দেয় আমার বুক পকেটে।

তারপর বহু কাণ্ড কারখানা করে সাত দিন পর ফিরি নিজের হস্টেলে একরাশ মনখারাপ আর একরত্তি সুখের স্মৃতি নিয়ে। সবসময়েই মনে পড়ে দুনিয়ার সবচেয়ে দামি ফুল জাফরানি আলিয়া বা আলিয়া জাফরানের কথা। খাতা টেনে নিই, তার মুখের কথাগুলো হুবহু বসে যায় খাতার পাতায়। ছন্দ-মিল কোনোকিছুর তোয়াক্কা না করে।





Pankaj Kumar Mullick - A Versatile Genius

Compiled by: Girish Modi



Rare are those who become legends and rarer still are those who do so during their lifetimes. Singer, actor, playwright and music composer par excellence – Pankaj Kumar Mullick was one such who through sheer dint of genius and talent not only became a Living Legend but also a revered cultural icon of the nation during his lifetime. He was the exponent of Rabindra Sangeet, and was inspired by these words by Tagore himself: “All those lyrics of mine that I will not get the opportunity to set tune to during my lifetime, I leave to you to embellish them with your music.”

CAREER HIGHLIGHTS & SALIENT FACTS

- (1) He joined All India Radio (AIR), Kolkata in 1927, within a month of its inception. He was an integral part of AIR for nearly 50 years.
- (2) At AIR he set music to the immortal ‘Mahishasuramardini’, a program that has become a part of Bengali culture and synonymous with Durga Puja. It is broadcasted on every ‘Mahalaya’ morning and has had an uninterrupted run since its beginning in 1931 (with the exception of 1976).
- (3) He conceptualized and started the immensely popular live-music class titled – ‘Sangeet Shikshar Ashar’ which he conducted for 47 years, a record.
- (4) He became a part of Indian cinema right from the silent era, since 1931. He was a part of the star studded New Theatres Studio team for nearly 25 years.
- (5) Luminaries like K L Saigal, S D Burman, Hemanta Mukherjee, Geeta Dutt and Asha Bhosle sang under his music direction as did several other prominent artistes from Bengal and the rest of the country.
- (6) He was the first music director who introduced Rabindra Sangeet successfully in films.
- (7) He introduced interlude and interlinking music for the first time in Indian film-songs.
- (8) At a time when movie-making was not as prolific as it is now, he sang in, composed music for and occasionally acted in close to 100 movies. He was a part of Indian cinema from 1931 to 1969, a period of about 38 years. He, along with director Nitin Bose was instrumental in the introduction of playback singing in Indian cinema.
- (9) He recorded his first song when he was only 18 years old. His music career spanned an awe-inspiring 50 years. He officially composed over 5,000 songs in those 50 years.
- (10) He was appointed as the Honorary Advisor to the Folk Entertainment Section of the Government of West Bengal, from 1953 to 1968, by the Chief Minister of West Bengal.
- (11) He was regarded as one of the founding fathers of Bangla Adhunik Gaan, a sub-genre of Bengali songs.
- (12) He was bestowed upon prestigious titles like “Surosagar” in 1931, “Sangeet Ratnakar” in 1962 & Padmashree in 1970.
- (13) Rabindranath himself allowed him to set tune to a few of his poems, the most popular instance of which is “Diner sheshey ghumer deshey...”
- (14) He was invited to sing the inaugural song during the launch of television (Doordarshan) in the country.
- (15) At the behest of Sri Sarat Bose, Netaji’s elder brother, he sang “Kadam kadam barhaye jaa”, set to his version of the tune, with Prime Minister J L Nehru being present during the recording.
- (16) On Prime Minister Nehru’s request he sang and recorded the Indian National Anthem – “Jana gana mana...” in a style that was deemed to set the parameters to be followed during the singing of the anthem by all Indians. The recording was also played nationwide at almost every public place to familiarize every Indian citizen with the anthem of their newly formed independent country.
- (17) The Kolkata Municipal Corporation supported the erection of a statue in his honor at Maddox Square Park on Pankaj Mullick Sarani in 2010. 🌸

ডেরেক ওয়ালকট

রবীন্দ্র চক্রবর্তী



আমার জিনেতে রয়েছে নিখো,
ডাচ-বুট-জার্মান,
হয় আমি কেউ নই, নয়
আমার মধ্যে বিপুল বিশ্ব
রয়েছে বর্তমান।

নোবেল বিজয়ী কবি বলে যান,
তেজস্বী মধু-ভাষ,
সত্যি কি তিনি সামনে দাঁড়িয়ে,
মনেতে অবিশ্বাস!!

প্রতিটা শব্দ, প্রতিটা বাক্য,
প্রতিটা চিন্তারেখা,
দাগ কেটে কেটে, মনের গহনে,
ফোঁটায় চিত্রলেখা।

অতীতের ছায়া কবি বললেন,
পড়ে এ যুগের ভালে,
দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হয়
সে আপন তালে।

ধীরে ধীরে সে যায় এগিয়ে
ভবিষ্যতের দিকে,
তাই বুঝি দ্যাখো ঐ রাঙাকাশ
লাগে চোখে আজ ফিকে!

কবি পড়লেন আপন কবিতা
জানি না কতক্ষণ,
মন ভরে নাকো, তবু হয়ে যায়
সময় যে সমাপন।

সভায় আছেন গুণী-জ্ঞানী কত
নামজাদা প্রফেসার -
আমরা কেবল দুই ভারতীয়,
ছাত্র সেখানকার!

ডেরেক ওয়ালকটের সঙ্গে কবি / ১৯৯২

Sir Derek Alton Walcott, KCSL, OBE, OCC (23 January 1930 – 17 March 2017) was a Saint Lucian poet and playwright. He received the 1992 Nobel Prize in Literature.[1] He was Professor of Poetry at the University of Essex from 2010 to 2013. His works include the Homeric epic poem Omeros (1990), which many critics view "as Walcott's major achievement." In addition to winning the Nobel Prize, Walcott received many literary awards over the course of his career, including an Obie Award in 1971 for his play Dream on Monkey Mountain, a MacArthur Foundation "genius" award, a Royal Society of Literature Award, the Queen's Medal for Poetry, the inaugural OCM Bocas Prize for Caribbean Literature,[3] the 2011 T. S. Eliot Prize for his book of poetry White Egrets[4] and the Griffin Trust For Excellence In Poetry Lifetime Recognition Award in 2015. (source: Wikipedia)

প্রশ্নের পালা শুরু হলো যবে
বুকেতে উত্তেজনা -
কতজনে কত প্রশ্ন করেন,
কবি রন একমনা।

আমেরিকার কবিতার কেন
এই হাল হলো আজি?
উত্তরে কবি বললেন, তবু
সঙ্গীত চলে বাজি!

তোমরা যারা এসেছ এ দেশে
ছেড়ে নিজ দেশ ভূমি,
যে গান বাজছে তোমার মনেতে
তারে মেরো নাকো তুমি।

ভুলে গিয়ে যদি আপনার সুর
হয়েছ আমেরিকান -
কবিতা হারাবে আপন মাধুরী
স্পন্দনহীন প্রাণ!

প্রশ্ন করতে দুরূহ দুরূহ বুকে
দাঁড়ালাম সভামাঝে,
আপনার 'পরে এশিয়ার থেকে
কোনো কি প্রভাব আছে?

বলিরেখাগুলো ফুটে বের হলো,
বললেন থামি থামি,
আপশোষ হয়, বাংলা ভাষায়
পড়ি নি টেগোর আমি।

গর্বেতে মোর বুক ভরে এল,
মধুর সে স্মৃতি পট,
মিশিগানে দেখা নোবেল বিজয়ী,
ডেরেক ওয়ালকট!

লাস ভেগাস

রবীন্দ্র চক্রবর্তী

লাস ভেগাস বাকবাকে শহর,
কত বাহার, কত বহর!
এম জি এম, লাক্সার, কসমোপলিটান -
প্রাসাদের পর প্রাসাদ, আলিদার শান।
এ বলে আমায় দ্যাখ, ও বলে আমায়,
ক্যাসিনোর চমকে শোক চাপা পড়ে যায়।
কত লোক, কত কোলাহল,
অফুরন্ত এলকোহল -
নাচ গান আলো
মোহজাল বড় জমকালো।
শহরের মসৃণ ত্বক
দৃষ্টি করে অপলক,
রাত করে দিন -
নেশায় বিলীন,
বলে যেন ছুঁয়ে দ্যাখ নারে,
জিয়ে নে জীবনটারে
এসেছিস দুদিনের তরে,
কাল যাবি চলে -
কি এসে যায়, কে কি করে,
কে কি বলে?
এ শহর বিলোয় সুখ
নিয়ে নে যত চাস
ভরে তোর বুক।
কি চাই বল? কি তোর আশ?
এটা লাস ভেগাস।
অর্থ, নারী?
রাজকুমারী?
আছে গাদা গাদা শপ
সব নামজাদা।
লুই ভুতান, প্রাডা -
কেন বাঁচিস আধা?
ভুলে যা সব,
ভুলে যা বাস্তব!
জীবনটা কি সত্য
না মায়ার রাজত্ব?
ডলারের বনবান

সুন্দরীর অনাবৃত স্তন,
সুখ শুধু সুখ -
এ যে এপার
পৃথিবীর স্বর্গদ্বার!
আর ওপারেতে?
ওপারেতে গেছিলাম খেতে।
পার্ক করে গাড়ি,
রেস্টোরাণ্ট আছে সারি সারি।
সন্ধ্যা হয় হয়,
গাড়িতে উঠতে যাব
হঠাৎ কে কয় -
স্যার প্লিজ স্যার,
ওনলি টু হাভেড
রেড রোজ বেড।
গলায় অনুন্য়,
এনিথিং উইলিং, স্যার -
গাড়িতে উঠি, বন্ধ করি দ্বার।
আর্ত চোখ তার।
জানলা দিয়ে তাকালাম আমি
মেয়েটা কোরিয়ান,
নয় ভিয়েতনামি।
মনে পড়ে গেল কলকাতার রাস্তায়
ভিথিরীর দল।
জামা নেই গায়,
শিশুকোলে, ওরা অসহায়।
বাবু, দশ পয়সা দ্যান।
সারাক্ষণ শুধু ঘ্যানঘ্যান।
বলো তো কি কপাল?
ওরা শহরের দুর্গন্ধ জঞ্জাল -
শুধু অপমান!
তবু ভোলা কি যায়?
ওদের তো জামা নেই গায়!
কি জানি কি খেতে পায়?
আর এ মেয়েটার চোখ,

না হয় সে বেশ্যাই হোক!
তবু বাঁচতে সে চায় -
হঠাৎ কবিতাখানা মনে পড়ে যায়।
অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত
বায়ু -
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ উজ্জ্বল
পরমায়া।

কিন্তু কবি সে স্বর্গ কোথায়?
কোথা যাব, কোন ঠিকানা?

ফিরে আসি এপারেতে,
রাস্তায় যেতে যেতে
দেখি যেন অদৃশ্য পাঁচিল,
এপারের স্বর্গলোক মায়া স্বপ্নিল।
ওপারেতে নীরবেতে কষ্ট পায় প্রাণ,
তার হাহাকার স্পর্শ করে নাতো কান।
এসে গেছি হোটেলের কাছে,
স্বর্গলোক একেবারে অবিকল আছে।
সার-বাঁধা প্রাসাদ
কেন মনে হয়, ভিতে তার
গাঁথা অবসাদ?
উঁচু উঁচু স্তম্ভ
সেকি শুধু অর্থের
অর্থহীন দম্ভ!

মনে মনে ভাবি, এ কি সুখ?
না এ সুখের ভান?
এ প্রাসাদ প্রাণহীন,
শুধু পাষণ নির্মাণ!

ভুলতে পারি না সেই চোখ -
হোক না সে বেশ্যাই সে হোক!
এপারে ওপারে কোনো পাঁচিল তো নেই -
তবে ভগবান,
মানুষে মানুষে কেন এতো ব্যবধান?

শহর

শরণ্যা ভট্টাচার্য ঘোষাল

হার্টফোর্ড, কানেক্টিকাট

আমার বহু দিনের অনেক দেনা।

আমি একাই আমার ছোট্ট সোনা ॥

মনের ভেতর কালির কালো,

জমানো কলম।

যা অনেক আগে লাগত ভাল,

আরও নেব সঙ্গে করে,

পুরোনো বই বস্তা ভরে।

বাড়ির পাশের জংলা বাগান।

গায়ে মাখার গন্ধ সাবান ॥

শীতের সেই লেপখানাকে ।

যেটাকে মা উঠিয়ে রাখে ॥

তাকের ওপর ধুলোয় ঢাকা।

লোডশেডিঙের হাতপাখাটা ॥

তারে সঙ্গে নিতেই হবে

এক টুকরো ঝাপসা শহর।

এসব নিয়ে ঝোলায় আমার।

এবার আমি হব রানার ॥

থাকবে না তো জায়গা থামার ॥

যখন যেরম ইচ্ছে হবে।

ঘর তো আমার সেথায় রবে ॥

আবার শহর মিলবে যবে।

মিটিং মিছিল কলরবে ॥

বলব আমি তোমায় আবার।

প্রেম তো তুই ছিলি আমার ॥



Bisarjan

Usree Bhattacharya

The wind hurtles into a turquoise sea
That froths, and beckons me.
The midday sun ignites the sky
Echoing my soundless cry.

At the precipice of infinity
I stand, in deep affinity;
Clayey feet primed to lunge
In a quick, bracing plunge.

I submerge, and the water swells
As I surrender to my several hells.

মাতৃরূপেণ

ডঃ সজল চট্টোপাধ্যায়



ফুলে ফেঁপে ছিল শিরা উপশিরা চরম ত্রাস!
আমার মায়ের জীর্ণ পাঁজরে গোঙানি শ্বাস।
ধমনীতে শেষে বয় না রক্ত, রুদ্ধ কণ্ঠ, নিথর প্রাণ।
সুপ্তিতে তার তৃপ্তি মিলেছে বারিধারা ঝরে, বিষাদ স্নান।

পানদোক্তার রাংতায় মোড়া আমার মা
খোলা রোদুদুরে ভিজে গামছায় জড়িয়ে গা
ঘুরতেন তিনি বিলোতে জীবন পরম ধন।
আজ সব খাঁ খাঁ, বড় লাগে একা, ব্যথিত মন
খুঁজে ফেরে ঘরে কোথায় লুকোলি আমার মা?
সারমেয় শৌঁকে ভাঙা শয্যার লোহার পা।

বৃষ্টিতে ভেজে উঠোনের তারে যত বসন।
ওষুধের বড়ি বোতলে বন্দি, কি প্রয়োজন?
মেলাটোনিরের হাত না ধরেই ঘুমোয় মা।
নাকের ডগায় কালশিটে ফেলে যে চশমা
অনেক বছর দেখেছে যে সব অত্যাচার,
বিদেহী ক্ষমায় মুছে গেছে আজ অন্ধকার।

পুজোর মঞ্চে ঢাকের বাদ্যি ধুপ ধুনো।
ঐটোকাঁটা রোদে কাড়াকাড়ি ভিড়, সিঁদুর পা।
চাতকী হৃদয় উজানেতে ফেরে ঘরকুনো।
চিরনিদ্রায় বিলীন আজকে আমার মা।
ত্রিনয়নে টানা কাজল সুর্মা প্রসারি হাত
বিশ্বজননী বরাভয় দেন ভক্তদের।
আমার গৃহেতে কেবল ব্যাপ্ত অন্ধ রাত!
ফরিয়াদী স্মৃতি মনের আগলে বন্দি ফের।

কাঁসর ঘন্টা শব্দ ধ্বনিতে দেবী বোধন।
চিতার অনলে সাঙ্গ মায়ের বিসর্জন।
ভোরের আকাশ রামধনু রঙে রঞ্জিত।
সবার মাঝারে দেবী ঘোরে ফেরে, মাতৃরূপেণ সংস্থিত॥



মলাট

সমর মুখোপাধ্যায় (ওকল্যান্ড, ক্যালিফোর্নিয়া)

কড়া রোদ্দুরে মুখের চামড়া পাঁশুটে ক্যানভাসের মত হয়ে গিয়েছিল। তার ওপর যৌবনের নানা অত্যাচার তুলির আঁচড়ের মত দাগ রেখে গেছে। ছিপছিপে লম্বা, পেটা চেহারা। চটা-ওঠা জিসের পাদুটো, আধ-হাঁটু উঁচু চামড়ার বুটের ভিতরে গোঁজা। গায়ে লাল চেকের জামা। মাথায় গেরাটোপের টুপি, কানের দিকদুটো উঁচুকরে তোলা। খাঁটি টেক্সান। শরীরে নেই মেদ, মনে নেই ভয়। জন বি. ফ্রিম্যান।

জোয়ান বয়সে র‍্যাঞ্চে কাজ করার সময়, হঠাৎ একদিন সেনাদলে নাম লিখিয়ে ফেলল জন। ওর মা বাবা আত্মীয় স্বজন কেউ ছিল না। শুনেছিল যে ওর বাবা ছিল খুব খাটিয়ে সাহসী মানুষ, কিন্তু নিঃসঙ্গ। সংসার ওকে বেঁধে রাখতে পারেনি। তারার নীচে খড়ের বিছানায় ঘুমোলে, পরের

দিনটা সে আরম্ভ করতে পারত নতুন উদ্যমে। আকাশের দিকে তাকিয়ে, সারা দুনিয়াটাকেই সে মনে করত নিজের ঘর। বাবার কথা ওর মাও খুব একটা বলত না। চায়নি যে জন বাবার মত হোক। তবুও, জন যখন প্রতিবেশী অ্যান্ট মিলড্রিডের কাছে শুনেছিল যে ছোট্ট জনকে বাবা ঘোড়ায় করে এখান ওখান নিয়ে যেত, তখন থেকেই ও সেই দিনগুলোতে ফিরে যাবার চেষ্টা করেছে। বাবা গাছের ডাল কেটে গাড়ী, বাঁশি, ছিপ, তীর ধনুক বানিয়ে দিত। বাপ ছেলের মধ্যে একটা নির্বাক ভাষা ছিল। মা বলতো, প্রতিবছরের মত সেবারও জুলাইয়ের গরমে বাবা গরুর পাল নিয়ে উত্তরে গিয়েছিল। মাস তিনেক পরে মালিক গরুগুলো ফেরৎ পেয়েছিল বটে কিন্তু সে আর ঘরে ফেরেনি। জন তখন চার। তখন থেকে মায়ের কাছেই মানুষ। সে যখন

ষোলো, সেই মা দুদিনের জ্বরে ইহলোক ছেড়ে চলে যায়। যাকে সারা জীবন ধরে বাবার মত হতে দিতে চায়নি, তাকে বাবার মতই একাকী করে দিয়ে বিদায় নিল মা। তাই র্যাক্স ছেড়ে মিলিটারীতে যাবার সময় একবারও পিছনে তাকায়নি জন। ওর পিছনে ছিল টেক্সাসের ঝলসানো প্রান্তর, যেখানে ওর জীবনের কোনো আগাছাও বেঁচে ছিল না। শুধু কষ্ট হয়েছিল পুরনো সঙ্গী 'ন' মিলিটারীর ব্যারেটটাকে ছেড়ে যেতে। পরে, ছোট বড় রাইফেল চালাতে পেরে দুঃখটা কিছুটা ভুললেও, ঐ ছ-ঘরাটা প্রথম বান্ধবীর মত মনে গেঁথে ছিল অনেকদিন। দশ বছর নানা জায়গায়, কখনও যুদ্ধ, কখনও শান্তিরক্ষার কাজ করে, একদিন যেমন হঠাৎ করে নাম লিখিয়েছিল তেমনই আচমকা নাম কাটিয়ে বেরিয়ে এসেছিল জন, কোথায় যাবে তার হদিশ না করেই।

* * *

গুলি গালাজ ঘুঁষো ঘুঁষি আর হাড়ভাঙ্গা খাটুনির সঙ্গে জন ছোট থেকেই পরিচিত ছিল, তাই সেনাদলে থাকার সময় ওগুলো তেমন গায়ে লাগত না। রক্তবন্যা, ছিন্নাঙ্গ, মৃত্যু - তাও গা সওয়া হয়ে গিয়েছিল। শত্রুসেনার বুক আর র্যাঞ্চার হরিণের মাথা, একই ভাবে টিপ করত দুটোই, দিনের কাজ। ঘোড়ার পিঠে চড়ে দড়ির ফাঁস ছুঁড়ে ছুটন্ত গরু ধরার মত, পলাতক শত্রুসেনা ধরার মধ্যেও ও একইরকম উত্তেজনার ছোঁয়াচ পেত। সবই ছিল সোজা হিসাব।

একদিন সেনাশিবির ছেড়ে, জঙ্গল পেরিয়ে, এক ছোট শহরের কিনারায় শত্রুপক্ষের সঙ্গে মরণ বাঁচন লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়েছিল জনের কোম্পানী। অভিনব কিছু নয়। বিদেশের জলায়, জেঁক মশার কামড় সামলে অনেকবার লড়াই করেছে। কিন্তু সেদিন জীবনপথের সামনের বাঁকের ওপারটা ছিল নিতান্তই অজানা। ঐ ছোট শহরটা গড়ে উঠেছিল শত্রু সেনাবাহিনীর জন্যেই। আশপাশ ছিল ওদের নখদর্পণে। চারদিকে ফাঁদপাতা থাকলেও, আচমকা আক্রমণ করে নিমেষে উপে যাওয়ার যাদু জানত ওরা। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র প্রায়ই ওদের আকস্মিকতায় থমকে যেত। সেদিন প্লেটুন কমান্ডার জনের খসড়া অনুযায়ী শিবির ছেড়ে জঙ্গলের দুপাশে লুকিয়ে ছিল ওদের দল। শত্রুপক্ষ শিবিরের ওপর বোমাগুলি চালিয়ে পালাতে গিয়ে দেখল ফেরার পথ বন্ধ। তেরোজন ধরা পড়ল। গোধুলির আলোয়, পিঠে বন্দুকের নল ঠেকিয়ে বন্দীদের এক জায়গায় জড়ো

করা হল, জনের দায়িত্ব, ওদের ব্যবস্থা করা। কিন্তু কোথায় জন? বন্দীরা গাছের তলায় বসে। কেউ উবু হয়ে, কেউ আধশোয়া, ঝিমন্ত, হয়ত বা আধমরা। আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা হয়েছে, জন্তু জানোয়ারের মত। ব্যথা যন্ত্রণার দিকে না তাকিয়ে। আরও কিছুদিন জিইয়ে রাখতে হবে, আরোগ্য অপ্রধান। রক্তভেজা ফেটী, ছেঁড়া জামা আর কাদায় মোড়া লোকগুলোকে ঘরের কোনে পড়ে থাকা ছেঁড়া ন্যাকড়ার মত লাগছিল। আশঙ্কাভরা প্রতীক্ষা ওদের শরীরের যন্ত্রণাকে গলা টিপে চুপ করিয়ে রেখেছিল। যাদের প্রাণ নিতে এসেছিল, তাদেরই হাতে প্রাণের মালিকানা তুলে দিয়ে ভয়ঙ্করের অপেক্ষায় বসেছিল ওরা।

হঠাৎ ঢালু খাঁড়ির দিক থেকে ভেসে এল গলার আওয়াজ! কি যেন নড়ে উঠল? নিমেষে দুজন বন্দুক উঁচিয়ে ধরল বন্দীদের দিকে। বাকীরা একহাঁটু গেড়ে অজানা শত্রুর দিকে নিশানা বাঁধল। বন্দীর দল সোজা হয়ে বসতে গিয়েও থেমে গেল। দুদিকে দুটো একে৪৭। শত্রুমিত্র আশা আশঙ্কার বিশৃঙ্খলায় সময় রইল থেমে।

“কে? জিমি? জন, না কি? ওখানে কে?” একজন মিত্র সৈন্য আরেকজনকে কাঁধ থেকে নামিয়ে মাটিতে শোয়াচ্ছে! আহত সঙ্গীকে কাঁধে করে চড়াই পেরিয়ে আসার এত ক্ষমতা আর সাহস কার আছে? দুজনকে বন্দীদের দায়িত্বে রেখে বাকীরা দৌড়ল উদ্ধৃশ্বাসে। রক্তাক্ত ছিন্নভিন্ন জিমি মাটিতে পড়ে, অজ্ঞান, একটা পা নেই। পাশে শোয়া জন, হাঁপের দমক সামলে শেষ ফোঁটা শক্তি দিয়ে জিমির ক্ষতটা চেপে ধরে আছে। ওখান দিয়ে প্রাণটা যেন বেরিয়ে না যায়! সঙ্গীদের দেখে, সেটাও আর ধরে রাখতে পারল না জন, গড়িয়ে পড়ে নিস্তেজ হয়ে গেল নিজে। তারই মাঝে আঙুল তুলে দেখাল রেডিও আর জিমির দিকে। ততক্ষণে দুজনকে কাঁধে তুলে নিয়েছে বাকীরা।



বাইরে হেলিকপ্টারের আওয়াজ। ওদের নিয়ে যাবে বেসক্যাম্পের হাসপাতালে। প্যারামেডিকরা দৌড়ে তাঁবুতে ঢুকেই সেলাম জানাল জনকে, অসীম সাহসিকতার জন্যে।

এ হ'ল সৈন্যদলের সর্বোচ্চ আদর্শ। এ বীরত্ব সারা দেশের কৃতজ্ঞতার দাবী রাখে। এ কাজ রাষ্ট্রপতি পুরস্কারের যোগ্য। জিমির অনেক রক্তপাত হয়ে গেছে, অজ্ঞান। মেডিকরা অস্ত্রের হাঙ্গুল, কিন্তু জন কিছুতেই যেতে চাইল না প্লেটুনের দায়িত্ব ছেড়ে। অগত্যা জিমিকে নিয়ে উড়ে গেল মেডিকরা। ঘোরের মধ্যে রাত কাটল জনের।

“স্যার, রাত্তির থেকে বন্দীদের বসিয়ে রেখেছি, ছেঁড়া কাটা য ওষুধ দিয়েছি আর নুডল-সস দেওয়া হয়েছে। ব্যাস।” কর্তব্যের তাগিদে, মুচড়ানো শরীরটাকে হিঁচড়ে বাইরে নিয়ে এল জন। শত্রুসেনা বন্দী করার উদ্দেশ্যে, বিড়ম্বনায় এসে দাঁড়িয়েছে। একজন বলে উঠল, “সবকটাকে সাবাড় করে দিলেই তো ল্যাটা চুকে যায়। ওরাও তো আমাদের সাবডাতেই এসেছিল, তবে অত পিরীত কেন?” দাঁতে দাঁত চেপে ওর দিকে তাকাল জন, মুখের দাগগুলোকে আরও গভীর দেখাল। গাছের তলায় বসে থাকা শত্রুসেনাদের এক এক করে দেখতে লাগল। বেশীরভাগই মাথা তুলল না। গোঙানীর আওয়াজ। কেউ ঘুমোচ্ছে, হয়ত! আট নম্বর উবু হয়ে বসে। উষ্ণ খুস্ক চুল, পোড়া চামড়া, চ্যাপ্টা নাকের দুপাশে ছাড়াছাড়া ঢোকা চোখ। ছোটখাট চেহারা, হয়ত খেতে পেতনা ভাল করে। ঘাড় বঁকিয়ে তাকাল জনের চোখের দিকে। মনে হল কোঠর থেকে ওর দৃষ্টির লেজাররশ্মি এসে জনের হৃৎপিণ্ড ভেদ করে শিরদাঁড়ায় ধাক্কা দিল। লোকটার দৃষ্টি বেয়ে ওর দুর্বলতার আগুন এসে ঘিরে ফেলল জনের সম্মুখ। পালাতে চাইছিল জন, কিন্তু নড়তে পারল না। লোকটা বাঁহাতে পেট চাপড়ে ডানহাতের তালুটা এগিয়ে দিল, পরক্ষণেই বাঁহাতের তর্জনি ঠেকাল নিজের বুকে। পাশ থেকে একজন প্রাইভেট বলে উঠল, “ও বলছে, হয় আমার পেটে দাও রুটি, নাহলে বুকে একটা বুলেট।”

চিৎকার করে উঠল জন, “জঙ্গলের ধার পর্যন্ত গিয়ে ছেড়ে দিয়ে এস ওদের। এখানে এসে ওদের আমি মরতে দেব না। দেশ ওদের রুটি দিতে পারে না, তাই কানে দেয় মস্ত্র। নিজেদের হাত পরিষ্কার রেখে মরতে পাঠায় আমাদের হাতে।”

বন্দীরা অতিকষ্টে চলার জন্যে তৈরী হচ্ছিল। মুখে শুধু ছেঁড়া স্বস্তি, আনন্দের ছায়া নজরে পড়ছিল না! আট নম্বরের ডানহাতটা তখনও পাতা। আড়চোখে দেখে, আবার শিউরে

উঠল জন।

মেস সার্জেন্টকে ডেকে জিগ্যোস করল, “প্লেটুনের কতদিনের রসদ আর বাকী?”

“টেনেটুনে বড়জোর তিনদিন।”

“আমার পুরো রেশনটা আমায় দিয়ে যাও, এক্ষুণি।”

রেশনের ব্যাগটা আট নম্বরের হাতে ধরিয়ে দিয়ে জন দৌড়ে ফিরে এল তাঁবুতে। সন্ধ্যাবেলায় হেডকোয়ার্টার থেকে হুকুম এল, কাল প্লেটুন ফিরে যাবে। সবাই খুশী। নির্বিকার জন। রাতের পাহারাটাকে আরও জোরদার করে, কয়েকটা জরুরী চিঠি লিখেই শুয়ে পড়ল। তাঁবুর বাইরে চাপা হুল্লোড় আর গান। পরের দিন বেসে পৌঁছতে বেশ রাত হল। তাও সকলে ছুটে এল অভিনন্দন জানাতে। জনের মুখে কেমন অনুপস্থিতির ভাব। ঐ রাতেই ও দেখা করতে চাইল লেফটেনেন্ট কর্নেলের সঙ্গে, হাতে চাকরি ছাড়ার আবেদন। কিন্তু কেন? জন শুধু বলল, “আমার এখন যাওয়ার সময় এসে গেছে।”



দেশে ফিরে কদিনের মধ্যেই হাসপাতাল, সাক্ষাৎকার, কাগজ রসিদ সব হয়ে গেল। শেষ সইটা করে, পাশ বালিশের মত ব্যাগটা কাঁধে ফেলে বেরিয়ে পড়ল জন। আজ থেকে আবার সাধারণ নাগরিক। ফুটপাথে নেমে ঘাড় ঘুরিয়ে শেষবারের মত একবার মিলিটারী দপ্তরের দিকে তাকাল, পরনে তখনও সেনার পোষাক। এগিয়ে চলল বাস টার্মিনাসের দিকে, তখনও ঠিক করেনি কোথায় যাবে! রাস্তায় অনেকেই হেসে দুচারটে কথা বলছিল, সৈনিকের সম্মান জানাচ্ছিল, যেমনটা নিয়ম। দেশের মানুষের এমন অভিনন্দনে মনটা যেমন ভরে উঠছিল, বোঝাটাও যাচ্ছিল কমে। তবুও কেমন গা ছাড়া লাগছিল, তাই বেশীদূর যাওয়ার কোনো তাগিদ ছিল না। এই বাসটা প্রথম থামবে একটা ছোট্ট শহরে, পোর্টার, টেক্সাস। জীবনের পরের পরিচ্ছেদের টিকিট কেটে বাসে উঠে পড়ল জন।

পাশের আসনে এক ভদ্রলোক, জাস্টিন এলডার। আমুদে মানুষ, সবে পঞ্চাশ পেরিয়েছে। নিজেই আলাপ করলেন। পোর্টারের লোক, এক বার-বি-কিউ রেস্তুরেন্টের মালিক। জাস্টিনের মতে অত ভাল বার-বি-কিউ তামাম টেক্সাসে আর কোথাও হয় না। একথা সেকথায় জনকে জানার পরে, জাস্টিন ওকে নিজের বাড়িতে কদিন থাকার নেমন্তন্ন করল, যতদিন না নিজের একটা ব্যবস্থা হয়। সদ্যফেরা সৈনিককে সাহায্য করার সুযোগ পাওয়াই তো ভাগ্যের কথা। জাস্টিনের এক মেয়ে, শ'চারেক মাইল দূরে ডালাসে থাকে। বৌ গেছে সেখানে আঁতুড় তুলতে। প্রথম নাতনী, দাদু দিদিমা খুব খুশী। জাস্টিন বলল, “মেয়েই ভাল, টীনএজটা মানে মানে পার হলেই মা-বাপের কথা ভাববে, ওদের দেখবে। ছেলেগুলোকে ভরসা নেই, কখন যে কি গোঁয়ারতুমি ধরবে ঠিক নেই।” অনভিজ্ঞ জন হুঁ হুঁ করে এগিয়ে চলল। তবে দাদুর মুখের হাসিটার মধ্যে যে একটা বিশুদ্ধ নির্মলতার মেজাজ ছিল তা ওর নজর এড়াল না। মনে পড়ল, র‍্যাঞ্চার গরু ঘোড়ার সদ্যোজাতদের দিকে তাকালে, ওর নিজেরও একটা নির্ভেজাল আনন্দ হত।

পরের দিনটা গড়িমসি করে আশপাশের হালচাল দেখতে দেখতে কেটে গেল। কিন্তু আলসেমি ওর ধাতে সয় না। দ্বিতীয় দিনই বেরিয়ে পড়ল শহরের দিকে থাকার জায়গা, কাজ, পোস্টাফিস ইত্যাদির সন্ধান। পোর্টার খুবই ছোট, মাইল খানেক লম্বা মেন স্ট্রিট, তার দুপাশে দোকানপাট, অফিস। বেশীর ভাগই একতলা। কিছু দোতলায় আছে থাকার জায়গা। আড়াআড়ি রাস্তাগুলোর ওপর ছোট ছোট বাড়ি, ব্যবসা, গীর্জা, টাউন হল আর লাইব্রেরী। খুব জোর আধঘন্টা হাঁটলেই শেষ। এর বাইরে ক্ষেতি, আস্তাবল আর দুচারটে মেরামতির কারখানা। একটা বুড়ো বর্ধিষ্ণু গ্রাম। এখানে সপ্তায় দুদিন কাগজ বের'য়, তা থেকে অবশ্য সবসময় বোঝা যায় না যে বাইরেও একটা জগৎ আছে। তাই এ চত্তরের কাজ, কেনাবেচা বা থাকার জায়গার খবরাখবর বেশীরভাগই লোকমুখে হয়। এমন জায়গায় উটকো লোককে যে বেশী কাঠ খড় পোড়াতে হবে তা জনের জানা, এমনি এক শহরেই তো সে বড় হয়েছে। তাই লোকের মুখে যেখানে সবচেয়ে বেশী ফুট ধরে, সেখান থেকেই শুরু করল জন। জ্যাকস ওয়াটারিং হোল পোর্টারের তুলনায়, সম্ভ্রান্ত বার।

দুপুর বেলা, খদ্দের কম। তাতেও, বিয়ারের দ্বিতীয় বোতলটা পাশের এক খদ্দেরের সৌজন্যে এসে গেল। ততক্ষণে মিলিটারীর গল্প জমে উঠেছে। মালিক জ্যাক, সুড়সুড়ি দিয়ে খবর নিয়ে নিয়েছে জন কেন, কোথায়, কি মতলবে এসেছে। জাস্টিনের অতিথি শুনে একজন বলল, “আরে তুমি তো তাহলে আমাদের পাড়ারই লোক।” জন বুঝল এ চত্তরের কাজ থেকে হাঁড়ির খবর, সবই এখানে বসে পাওয়া যাবে। কটা থাকার জায়গার খবরও পাওয়া গেল। কাজের খোঁজগুলো যদিও ঠিক মনের মত হল না। পরের কদিন মেন স্ট্রিটের ফুটপাথ দিয়ে ঘোরাঘোরি করার সময় অনেকেই দাঁড়িয়ে দুচার কথা বলল। পোর্টারে একটি নতুন মুখ দেখা গেছে তা তখন অনেকেরই জানা। তার সঙ্গে আগন্তকের জীবনলিপির অংশবিশেষও বাজারে ছড়িয়ে পড়েছে। পোস্টমাষ্টারবাবু, ব্যাঙ্কের ম্যানেজারবাবু, পাদ্রীসাহেব, সকলে জনের খবর পেয়ে গেছেন। অনায়াসেই জন হয়ে উঠল স্থানীয় বাসিন্দা।

একদিন মেন স্ট্রিটে পায়চারী করার সময় একটা দোকানের জানলায় চোখে পড়ল একটা “চাকরি খালি” বিজ্ঞাপন। আনমনে দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ল জন। এক মাঝবয়সী মহিলা, মৃদু হেসে অভ্যর্থনা জানালেন। দেখেই মনে হল, এ চত্তরের পক্ষে রিসেপসানিস্টের সাজটা একটু বেশী হয়ে গেছে। চাকরীপ্রার্থী শুনে অল্পক্ষণের মধ্যেই কালো সুটটাই ও চকচকে কালো জুতো পরা এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। নিপাট ব্যাকব্রাশ করা চুল, বুক পকেটে সাদা পরিপাটি রুমাল। কথাবার্তাও বেশ মার্জিত। এখানকার ম্যানেজার ও মালিক, জেরী মিলার। খোঁজখবর না নিয়ে ঢুকে পড়ে জন অপ্রস্তুত বোধ করতে লাগল। তখনও জানত না কীসের অফিস এটা?

ঘরে বসিয়ে জেরী বলল, “এই একই জায়গায় নব্বই বছর ধরে আমাদের তিন পুরুষের ব্যবসা। এখানকার পঁচিশ তিরিশ মাইলের মধ্যে আমরাই সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য। আমাদের নিজেদের জমি আছে, চুল্লীও আছে। কোনো পরিবারকে নির্মম সময়ে দৌড়োদৌড়ি করতে হয় না। আমরা এখানকার সবচেয়ে নামকরা সংকার প্রতিষ্ঠান।” চমক ভাঙ্গার পরেও, এখানে ও কী কাজ করতে পারে তা ভেবে পেল না জন। র‍্যাঞ্চার জন্তু জানোয়ারের জন্ম দেখেছে, চলার পথে দেখেছে জীবন, মিলিটারীতে দেখেছে

মৃত্যু। ভেবেছিল ওখানেই শেষ। এখানে তাহলে কি দেখবে, মরণের পর? জেরীর সঙ্গে কথা বলে মনে হল মৃত্যুর সম্বন্ধে এমন করে জন কোনোদিন ভাবেনি। জেরী বলল, “মৃত্যুর পর কী, ধর্মই আমাদের সে কথা বলে। অথচ নানাধর্মের নানা মত।” মুচকি হেসে বলে চলল, “সবাইকার আবদার যে তারাই ঠিক, বাকিরা অবিশ্বাসী, স্লেচ্ছ। ভগবানের তাই বিধান। কিন্তু এই তিরিশ বছর ধরে মৃত্যু ঘাঁটার পর ও নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না। আমি জানি যে মৃত্যু হল জীবন বইটার শেষের মলাট।” জেরীর কাজ হ’ল মলাটটাকে নিখুঁত করে সাজিয়ে দেওয়া। মৃত্যু মানুষকে যে স্থিতি আর শান্তি এনে দেয়, তাকে সুন্দর করে একই সঙ্গে আহ্বান ও বিদায় জানানোকেই জেরী মনে করে তার কর্ম।

কাঁচের জানলাটার বাইরে ভুট্টার ক্ষেত। ফসল তোলা শেষ। শুকনো গাছগুলো পড়ে আছে মাটিতে আর তারই মাঝে দাঁড়িয়ে একটা ছেঁড়া কাকতাড়ুয়া। সেদিকে তাকিয়ে আবেগভরা গলায় বলে চলল, “প্রত্যেকটা মৃতদেহের মধ্যে আমি দেখি স্বর্গের ছোঁয়া। নবজাত শিশুরা যেমন কান্নাহাসির মধ্যে দিয়ে পরমাত্মার স্বর আমাদের কানে পৌঁছে দেয়, মৃতেরাও তেমনি দেয়, প্রশান্ত মৌনতায়। ঐ সন্দেশ পাঠাতে প্রাণ বা দেহ, কিছুই প্রয়োজন হয় না।”



বেড়ায় ঘেরা উনিশ একর জমি নিয়ে কবরখানা। কবরের সংখ্যা, হাজারে। বেশীর ভাগ কবরের ওপরেই কাঠের বা ইঁটের ক্রশ। কিছু ওপর পাথরের ফলক, যার কারুকার্য আর আয়তন মৃতের পরিবারের আর্থিক স্বচ্ছলতার সাক্ষী। মাটির তলায় কিন্তু সব শবাধারের আয়তনই এক, পরলোকে সবাই সমান। সারা জমিতে কবরগুলোর মাথায় ছায়া দেওয়ার জন্যে বসান আছে নানা মাপের গাছ। বাকিটা, কেয়ারী করা ঘন সবুজ ঘাসে মোড়া। মাঝ দিয়ে লাল মোরামে মোড়া পায়ে চলা সরু রাস্তাগুলো এঁকে বেঁকে চলে গেছে। কোনো কোনো কবরে ফুলের তোড়া, যাদের মনে করার লোক এখনও আছে। বাকি ঘাসে মোড়া জায়গাগুলো অপেক্ষা করে আছে নতুন কারুর শেষকৃত্যের আশায়। সেখানে গর্ত

খুঁড়ে ব্যবস্থা করা হবে শান্তিশয্যার আর পাশে ঘাস লাগিয়ে সুন্দর করে রাখা হবে পরিবেশ। জনের কাজ হবে এই জায়গাটার দৈনন্দিন রক্ষণাবেক্ষণ আর নতুন কবরের ব্যবস্থা করা। র্যাঞ্চার অভিজ্ঞতা এখানে কাজে লাগবে ঠিকই কিন্তু মৃতদেহ নিয়ে কাজ করার কথা ভাবতে বেশ অস্বস্তি হচ্ছিল। তাই যখন দেখল, সমাধিতে আনার সময় শবাধারের ঢাকনা বন্ধ করে আনা হয়, তখন থেকে জন নিশ্চিত্তে নিজেকে কাজের মধ্যে ডুবিয়ে দিল। মৃতদেহের সঙ্গে মূলাকাতের কোন অবসর থাকল না।

কয়েক মাসের মধ্যে জায়গাটার চেহারা একটা চমক এসে গেল। পায়ে চলা রাস্তার ধারে, খুব ছোটছোট ফুলের গাছ আর নীচু আলো লাগানোর ব্যবস্থা করল জন। পাথরের ফলকগুলোকে পালিশ করা হল। ঝড়বৃষ্টির পর নরম জায়গাগুলোতে সাদা দড়ি দিয়ে ঘিরে দেওয়া হত যাতে কাদা মাখামাখি এড়াতে পারে পরিবারের লোকেরা। তৈরী হল কবরখানার মধ্যের সমাধিগুলোর নতুন মানচিত্র যাতে আপন জনের সমাধিস্থলে পৌঁছানো সহজ হয়। এমন কাজের লোক জেরী আগে পায়নি, তাই ছমাস বাদে নিজেই জনের মাইনে বাড়িয়ে দিল। কদিন পরে জন এসে প্রস্তাব দিল নিজেদের ফুলের নার্সারী তৈরী করার জন্যে, যাতে খদ্দেররা এখান থেকে তাজা ফুল কিনে সমাধিতে দিতে পারবে। জনের কথা, সুতরাং কিছু না ভেবেই রাজী হয়ে গেল জেরী। বছ বছর বাদে কবরের জমির দাম আর সৎকারের মজুরী বাড়তে লাগল জেরী। বিনা মেঘে ব্যবসায় এমন সুবৃষ্টি হবে জেরী ভাবতেই পারেনি। জনকে সাহায্য করার জন্যে জেরী একজন সহকারী নিয়োগ করার প্রস্তাব করল। জনের কিন্তু তেমন কোন তাগিদ ছিল না। কাজে উন্নতি হ’ল কি না হ’ল তা নিয়েও ওর কোনো ভাবনা ছিল না। তাছাড়া, বাইরের কাজ ওর বেশ ভালই লাগত। কিন্তু জেরীর ছিল অন্য মতলব, জনের মত লোককে চুল্লী আর শবদেহ প্রস্তুতির কাজে লাগাতে পারলে সেখানেও ও নিশ্চয়ই অনেক উন্নতি করাবে।

ব্যবসার নানা বিষয়ে জনের সঙ্গে প্রায়ই আলোচনা করত জেরী। শবদেহ প্রস্তুতির ছোটখাট সাহায্যের অজুহাতেও জনকে ডেকে পাঠাত। নাক সিঁটকালেও, সাহায্যপ্রার্থীকে ফেরাতে পারত না জন। একদিন জেরী কাজে আসেনি, প্রস্তুতির কোনো লোক ছিল না। অগত্যা জনকে সমস্ত

দায়িত্ব নিতে হয়। মৃতের আত্মার প্রতি সশ্রদ্ধ সম্মান দেখিয়ে সেদিনকার কাজ শেষ করে জন এক নির্বিকার ঔদাসিন্যে। অজান্তে সে শিখে নেয় বইয়ের শেষের মলাটটা দিতে।

দেখতে দেখতে সাতটা বছর ঘুরে গেল। জনই হয়ে উঠল ব্যবসার আসল লোক। জেরী, বয়সের অজুহাতে ক্রমশ আরও কাজের ভার জনের ওপরে চাপিয়ে দিয়েছিল। আর জন, জন্ম জীবন মৃত্যু পেরিয়ে যাওয়া দেহগুলোকে আরও নিরাসক্ত বিছিন্নতায় শেষকৃত্যের দিকে এগিয়ে দিয়ে চলেছিল। প্রতিবছরে পোড়ানোর তুলনায় কবরের চাহিদা কমে আসছিল, কিন্তু শেষযাত্রার প্রস্তুতির আড়ম্বর উঠছিল বেড়ে। আজকাল, মড়ার গায়ে সুগন্ধী ওষুধ মাখাতে ওর একটুও দ্বিধা হত না। হাত পা টেনে টুনে সোজা করে, জামা কাপড় পরিয়ে দিতেও ইতস্তত লাগত না। ওর কাছে ছেলে মেয়ে জোয়ান বুড়ো সবাই যে কখন সমান হয়ে গিয়েছিল তাও সে খেয়াল করেনি। গত কয়েক বছর ধরে নানা বিদেশী মানুষের দেহও আসতে আরম্ভ হয়েছিল। বহে যাওয়া নদীর জলে ফুল মল সবই চলেছিল ভেসে। মৃত্যু হ'য়ে উঠেছিল জনের জীবনেরই একটা অংশ।

একদিন বিকেলে দুটো দেহ এসে গেল প্রায় একই সঙ্গে। জনকে সাহায্য করার লোক সেদিন মাত্র একজন। প্রস্তুতির ব্যবস্থা করতে সেদিন কেমন যেন ক্লান্ত লাগছিল। প্রথমে মিসেস জনসন, এক অশীতিপর বৃদ্ধা। কোনোরকমে তার ব্যবস্থা করে, সাজিয়ে গুছিয়ে, ঠান্ডা ঘরে রেখে এল। তখন বেশ রাত্তির। তখনও আরেকটা বাকী, জেমস টাউন্সেন্ড। অনেক দূর থেকে এসেছে। সহকারীকে ওর প্রস্তুতি আরম্ভ করতে বলে, বাইরের খোলা হাওয়ায় একটু দম নিয়ে আসতে গেল জন। ফেরার যেন কোন তাগিদ ছিল না

সেদিন। অথচ কাজ বাকি, একটা ভূতপূর্ব মানুষের শেষ কাজ! বইটার শেষের মলাট। ফিরে যেতে একটু দেরীই হ'ল। ততক্ষণে শবদেহে জামা চড়ে গেছে। কিন্তু ঘরে ঢুকেই আঁকে উঠল জন, “জিমি?” সেই টিকলো নাক, সোনালী চুল! শবদেহের বাঁ পাটা নেই। জনের মনে হল ওর বুকে কেউ ছুরি মারল। আজ সে হেরে গেছে! নিজের জীবন বিপন্ন করে একদিন যাকে বাঁচিয়েছিল, সেই জিমিকে সে সত্যি বাঁচাতে পারেনি। উত্তেজনায় ঘর থেকে ছিটকে বেরিয়ে গিয়ে ফোন করল জেরীকে। কোন সম্বোধন না করে প্রায় হুকুমের সুরে বলল, “জেরী, কাল সকাল আটটায় আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই অফিসে, খুব জরুরী।” ক্লিক।

কাঁটায় কাঁটায় আটটা। কাঁধে একটা কাপড়ের ব্যাগ নিয়ে জেরীর ঘরে ঢুকল জন। ক্লান্তি আর হতাশা চোখের কোলে কালি হয়ে ফুটে উঠেছে। ডানহাতটা বাড়িয়ে দিয়ে সোজা চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, “বিদায় বন্ধু। আমার এখন যাওয়ার সময় এসে গেছে।” জেরী কিছু বোঝার আগেই দরজা ঠেলে বেরিয়ে এল রাস্তায়। একটু ধাতস্থ হয়ে জেরী যখন ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে ততক্ষণে জন ওর পিকাপ ট্রাকে স্টার্ট দিয়ে দিয়েছে। চিৎকার করে জেরী জানলার কাঁচে ধাক্কা মারতে লাগল, “কি হ'ল জন? কি হয়েছে তোমার? আমি কি কিছু করেছি? কোথায় যাচ্ছ, কোথায়?”

জানলার কাঁচ না নামিয়ে আঙুল তুলে সামনের দিকে দেখাল। জন ফ্রিম্যানের জীবনের পরের পরিচ্ছেদটা নিজের খেয়ালে এগিয়ে চলল শেষের মলাটের দিকে।



হারানো শব্দ

অর্ক পণ্ডিত

চেনা কয়েকটা শব্দ হারিয়ে ফেলেছি ঘুমন্ত বালিশে,
গড়িয়ে পড়েছে ঠোঠের কষ বেয়ে, চেনা কিংবা
অচেনা ব্যাঞ্জনা। নির্জন রোদ রাঙা ভিজে কার্গিশে
আরো কিছু চেনা কথা ফেলে এসেছি হয়তো বা।

কতক শব্দ হারিয়েছি ভিড় বাসে, অচেনা লোকাল
ট্রেনে; কিছু শব্দ গিয়েছে উড়ে উড়ে শালপাতায়,
তেঁতুলের গন্ধ মেখে। যেমন নামে অচেনা সকাল,
ভোরের বেলায়; তেমনি কিছু শব্দ নেমেছিল জামপাতায়।

অচল, অলস কিছু শব্দ, যাদের থাকা না থাকায় ফারাক
পড়েনি কোনোদিনও, নিঃসঙ্গতার ঝিকিঝিকি আগুনে
যারা জ্বলেছে বিষণ্ণতায়; তোরা আজ আমার কাছে থাক,
তোদের নিয়েই জীবন গাঁথব মনখারাপের মেঘলা দিনে।

যেসব কথা হারিয়েছিল পথের বাঁকে, ভিজেছিল কাকজ্যোৎস্নায়,
সিঁদুর রাঙা সন্ধ্যাকাশে তাদের সাথে আমার নিয়ত দেখা হয়।

A Poet's Promise

Dr. Jayanta Banerjee, Puerto Rico



A poem a day keeps my depression away!
I am a grown up adult now;
And I don't have to lament like Alexander Pope:
"Father, father, pity take;
No more shall I verses make."
I'd like to keep my promise to write a poem a day.
And yet I fumble.
It's not an easy task, I ponder.
Where is my inspiration today?
Where does it come from?
The blue sky, the green grass,
Or something that I don't see.
It's from within!
The painter living in Iceland
Floods her canvas with deep colors.
Where do the colors come from?
From her memory of Indonesia
Where she spent her childhood.
Poetry like painting needs that imagery
From within.
Within your mind that is not in front of your eyes!

গ্রহের গতি

ডঃ জয়ন্ত ব্যানার্জী, পোয়েটো রিকো



শ্রাবণে রাতের হাওয়ায় বিজলির সজল
পরশ,
পৃথিবীতে ঘুম নামে, মনে হয় সবাই অলস।
সময়ের শিহরণ
কি জানি কখন

দিয়ে গেল দোলা।

ক্লেটের কালিমামাখা ঘন মেঘে
বিজলির খেয়ালী আঁচড়ে
সূরের মেখলা।

‘দু একটি নামহীন তারা

কেন অত দিশাহারা?

সিফন শাড়ির আড়ালে

বুটিদার ব্লাউজের কোলে

জরির কার্ফ্যার্য বুঝি

প্রকাশের প্রসব বেদনা।

নামহীন! গোত্রহীন!

তবু

অনন্তের কক্ষপথে নিবু নিবু চোখে।

উতলা মেঘের কোন অরক্ষিত ফাঁকে

বিস্ময়ে দেখেছিল পৃথিবীকে।

সভ্যতার রত্নপণ্যভারে বোঝাই জাহাজ

কীর্তির কেতন আর শতাব্দীর ইতিহাস
আলোয়,

সাগরের তুহিন আঁধারে কোন পথে যায়?

সাহারা মরুভূ-বুকে মরীচিকা পিছে,

পথভোলা দমহারা বেদুইন বণিকের বেশে,

একাকী চলেছ কোন নীহারিকালোকে?

এক ফোঁটা জল

কাকলি চৌধুরী

কোন রূপেতে পূজিব তোমায়
পাগল এ মন বুঝিতে নারে;
সাগরের এক ফোঁটা জল
এই সাগরকে কি জানিতে পারে!

তুমিই যে শ্যাম, তুমিই শ্যামা
তুমিই যে শিব, তুমিই উমা;
আর কত রূপ, মোর নাই তো জানা
তাই হার মানে মন বারে বারে।
সাগরের এক ফোঁটা জল
এই সাগরকে কি জানিতে পারে?



অরূপ; তোমার সকল প্রকাশ
স্বরূপে তুমি দিয়েছ ঢেলে;
গুণাতীত হয়েও নিজে
স্বগুণেতে দিয়েছ মেলে।

তুমিই কর্তা, কারণ ও কর্ম
তুমিই ধাতা, তুমিই ধর্ম;
তোমার লীলার কী যে মর্ম!
এ মন তাহা বুঝিতে নারে।
সাগরের এই এক ফোঁটা জল
সাগরকে শুধুই মানিতে পারে।



I, Me, and My

Radhika Chatterjee

11th Grade

Star spangled banner, nicknamed Old Glory-
Saluting the American flag, I begin my story.
In the year 2000, arrived its 186th day-
Soaked with hope and happiness, and splendor in its way.
Before fireworks began to pound the darkened night sky,
I quietly stepped into the world, born on the 4th of July.

My grandma took me in her lap, beaming with a lot of pride.
I was an Independence Day baby, none could take me for an easy ride.
Though I am not President Coolidge, or Malia, a President's daughter,
I was special in some way-all the celebrations definitely taught her.

Thinking of my toddler and pre-K days, I remember nothing specific
Apart from the hugs and kisses, and sun rays that were prolific.
Buying an extra candle with each birthday cake later became a routine
For I wanted to make everyone happy- a trait coming from a caring gene.

Resilient, reliable, and responsible- hall marks of a zodiac sign,
Naturally friendly and caring are also qualities that easily align.
“We can't choose the lives we are born into,” my parents would often say,
“But we can choose the lives we want to be by helping the hapless on our way.”

People of different races and colors, of different names and heritage
Contribute to our book of knowledge-each supplying a relevant page.
All we have to do is to use our hearts when we attempt configuration.
Everybody is good if we take the time to provide support and affirmation.

Let me not get inside a glass box; “Connect with the world” became my song.



For even at an early age, I could separate the right from the wrong.
I protested against bullying while in middle school, not an act of bravery
Considering that on 4th of July in 1827, New York abolished slavery.

I am not rebellious; breaking the rules is not what I expect.
“Behave like a child who is mature and grown.
Treat everyone with empathy, love and respect.”
Grandma’s repeated words over time became my very own.

When someone suggested for me the name Independentia,
Never did I think for a moment how the curse of dementia
Could steal our yesterdays and push our tomorrows out of reach-
With no control over our actions or words that we use in a speech.

Sixteen years have passed-no major happenings, some occasional bumps,
But I have seen fragile people with faltering steps falling down the dumps.
Sinking in the void of nothingness, with no cure in immediate sight,
It is now very hard to gauge the depth of my grandma’s woes and plight.

In an old age care home where grandma went for recuperation,
I found a picture that said: “Sunset is no less beautiful than sunrise.”
My interest in volunteering services got another source of inspiration,
To appreciate and learn from experiences that humanize and make us wise.

I will have to wait till 2028 to reuse the entire 2000 calendar.
If I look for my grandma in that year, I know I may not even find her.
But I can vouch for her words ringing loudly in my ears:
“Stay firm on your principles with conviction and no fears.”

Contemplating on my time so far and where it has taken me,
I feel the passion in my heart for an ideal environment I want to see.
I am not an extraordinary girl; I just have one simple aspiration—
Let my life’s journey continue on a cosmic world, full of healing and rejuvenation.

তিনটি হাইকু

অনুবাদ - নবনীতা দেব সেন, কলকাতা

১

চটে মটে তো বাড়িতে ঢুকলাম
কিন্তু আমারই বাগানে কি বিনশ্র অভ্যর্থন
বুড়ো, সৌম্য উইলো গাছটার ॥ -- কবি: রিয়োতা

২

দ্যাখো দ্যাখো ভারি পাতাটা কেমন
নিবাত নিষ্কম্প দিনে
নিজের ইচ্ছেয় ঝরে যায় ॥ -- কবি: বনচো

৩

নৈশব্য ভাঙ্গলো না কেউই
অতিথি না
গৃহস্বামী না এমন কি
সাদা চন্দ্রমল্লিকাও না ॥ -- কবি: রিয়াতো



Beyond $E=mc^2$

A. N. "Shen" Sengupta

Going beyond Albert Einstein's Universe-shaking Equation of more than a century ago in 1905, is no easy task and it is near impossible for a non-physicist. The equation essentially says that all matter can be described in terms of energy and the speed of light (denoted by 'c'), which happens to be a mind-boggling 1,86,000 miles per second. This revelation led to the exploitation of matter by way of converting it into highly explosive energy, the form of which is popularly known as "nuclear energy".

Above understanding of the relationship between matter and energy has led some preachers to declare that our bodies are nothing more than frozen energy and that we can and should do "matter-control" and free ourselves from the bounds of our bodies and regain our energy identity or the real self. Some of the preachers claim that they themselves are or have been successfully practicing such control.

We also know that the visible Universe is much too fragile or wispy to be held together by the force of gravity between the fragments, which are generally known as galaxies. But then what holds them in place? Apparently some 90% of all matter is dark. There is no proof of its existence except by way of inference - it is apparently the glue that holds the visible Universe together. Without it, visible Universe would simply disintegrate into wisps of nothingness. Interestingly, we do not find any mention of "dark matter" in the pronouncements of those, who preach in favor of "matter control".

There is also a relentless search for dimensions beyond the ones we easily comprehend: the three dimensions of length, breadth and height. We also understand the

fourth dimension of "time" albeit somewhat vaguely. Einstein had attempted to explain the relationship between space and time, curvature of space and its shaping of so-called "Gravity" but in spite of his great genius he left unfinished the solution to the question of the interrelationship between space, time, matter and energy as one unified entity. Many physicists and mathematicians have since struggled to come up with an answer and have generally failed. The most well-known of these efforts is known as "The String Theory", which is based on the premise that at the sub-atomic level there is no particle of matter but only vibrations or strings. Yet there is no proof of it and the energy required toward proving it is apparently well beyond all available resources on the Earth put together.

This is where we come in. It is possible, just possible, that starting with the "Big Bang" some 15 billion years ago, when space and time exploded, a limitless amount of energy came into being and gradually matter was formed out of that energy, and ultimately resulted into you and I. So far so good, but lo and behold! Are we merely frozen energy? Not really. There is so much more, which remain a mystery and possibly will forever. We embody something beyond energy and matter. We embody "Life" and all its manifestations. Again, physicists, mathematicians and now chemists have attempted to explain "Life" in terms of chemical reactions, electromagnetic impulses and the like but has never been able to recreate "Life" with all its expressions, feelings and the myriads of emotions.

No one disagrees with Charles Darwin's "Theory of Evolution". But even Darwin fails to tell what exactly "Life" is and how it began. Granted, that once "Life"

dawned on the Earth, living beings evolved, starting with two-cell amoebas, to us humans. The question arises however, why did not other apes also evolve into humans or even will humans evolve into a hitherto unknown species? Incidentally, if anyone is thinking of visiting “The Planet of Apes”, you have arrived. The Earth is that planet. And if you are looking for the apes, they are us! Leaving aside these fanciful thoughts, we find that there is something very unique about humans: they can at ease go beyond space and time, they can do so through imagination or reflection. Humans can think about thinking and bring past, present and future together. They can create or bring into existence the unknown through arts, literature, science and technology. When we compare us with other intelligent animals or even the plant-world, which is known to have some form of intelligence, does human mind represent something way beyond electronic impulses and chemical reactions?

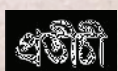
In this endless Universe, that has no center and no edges, only one infinitesimal speck of rock with water on its surface, a blue dot, almost miraculously harbors a near-impossibility: “Life”. Even though one can justifiably guess that the Universe is teeming with life, and for that matter Hubble Telescope is finding habitable planets around distant stars routinely, and one can hear about the possibility of the existence of “Life” elsewhere within our very own solar system, no one has yet been able to prove its existence outside our blue planet. Can then anyone come up with anything that has anywhere near its value? Even though we do not understand what “Life” is and how it has come about, no one can doubt that its evolution has taken some 15 billion years, out of almost nothing but an explosion of limitless amount of energy.

If we now make a conscious effort to free ourselves from the bounds of our bodies and regain our energy identity or the so-called real self, are we not going to throw away the product of 15 billion years of

painstaking evolution by the Universe, the greatest gift of all, “Life”? We are not talking merely about the most unique phenomenon called “Life”, which we share with myriads of other living beings and plants. We humans exhibit a level or kind of evolution which defies the essentially Earth-bound three or four dimensional existence and reaches out to the outer limits of the endless Universe. Must we make any effort to reverse that most unique happening or instead go further to wherever it takes us? Ironically, we do not have to make any effort to undo 15 billion years of evolution. Neither there appears to be the possibility of any alien invasion to annihilate “Life” from the Earth. However one can say with certainty that in a few billion years, our Sun will run out of its nuclear fuel and become a “Red Giant” and swallow the entire solar system, including humankind’s only home, the Earth.

It is fashionable to talk about how far artificial intelligence will go. It is quite possible that humans can and will teach robots to look and perform like humans whatever is possible through the evolution of super computers. They may even be given the power of destroying humankind but there is no proof yet that robots will ever be able to acquire the unique traits which sets humans apart from all other life-forms, evolved thus far, even after 15 billion years.

Humankind does not yet comprehend the mysterious workings of the Universe. Scientists are desperately trying to find dimensions beyond the four known ones. Perhaps the traits of “Life”, as evolved in human beings contain all or most of those missing dimensions. Perhaps it is not mere chemical reactions triggered by lightening in the formative billions of years of our Earth that has created “Life”. Perhaps it has not been brought by asteroids. Perhaps it has not been transferred from Mars, before “Life” died out there. Perhaps higher life, as expressed by feelings and emotions, by love and its opposite, have come from or are the manifestations of the



hitherto missing dimensions. That may also answer the eternal question: what happens when our bodies die, what happens to the soul? Again, assuming that only humans have a soul which gives expression to the uniquely human traits discussed above, perhaps it is possible that it returns to where it came from, the

hitherto missing dimensions.

As stated at the very beginning, I am no physicist or a mathematician or a chemist but I shall consider my discourse a success, if I can arouse even a bit of questioning in a young mind.



Artwork by: *Trisha Bhattacharya*, Age 16

Ingress: An Individual's Glimpse into the Fourth Dimension

D.J. Chakraborty

Welcome to the Ingress. Is it different from how you imagined it? You wanted to come here; much like others who toiled relentlessly for an invitation to ingress into the Ingress. The majority investigate out of curiosity, intellectual research, unhappiness with their lives, or passionate pursuit of some goal. However, only a small fraction is granted entry. Anyway, you have finally procured the ability to ingress the Ingress. What is that you ask? ... It is the wraith level you are seeing for the first time. You are used to viewing length, width, and depth only. This is the fourth dimension where we also have wraith. You will discover more advanced technology as well as advanced intellectual and spiritual knowledge. I am sure you will like it here.

Hey! Where are you going? ... I don't understand why you'd want to go back to that boring, primitive, three-dimensional world when it is so much better here! Some of our people, losers mostly go to your primitive world and become celebrities and get high on success there. It's like a drug. They procure great wealth and even the American Presidency. The average fourth-dimensioners find difficulty adjusting since they are more sophisticated and brainy.

You will return with a broader perspective and enhanced leadership skills which can be a gift or a curse. I know you understand that your actions should be performed impartially and appropriately in response to a given situation as opposed to acting in your own interest. At times the two

may coincide, but if not: You have the discipline to do right. Do you want to? The value of the greater good versus personal gain must be considered with every action. You can be an inspiration to help others overcome calamity or you can be the cause.

Do third-dimensioners think time is the fourth dimension? Time is higher. The fourth dimension is wraith. Here, there are no more superstitions, ghosts, or magic, good or bad omens. We are about logic and scientific facts.

Yes, there are other creatures like anima. The anima, exempli gratia fairies, elves, pixies, nixies, and such have great celerity which is the reason they were thought to be magical or imaginary. They are extant and live in their respective territories which are respected by humans and animals.

What? ... No; there is no paranormal or supernatural in the fourth dimension. You will find those are perfectly normal and natural.

Oh, time is higher than the fifth dimension. I am not telling you which; I have said too much already! You will gain all the answers in due course, once you commit to staying here.

Well, too bad that you prefer your dim third dimension. Here is the portal to return to your world. Decide carefully because you cannot return here once you choose to leave. Good Logic. Don't look at me like that. I have to follow the rules just like everyone else. I was hired to guide



newcomers because I myself am a descendant of newcomers and I am married to one. My father's family was granted ingress from the third dimension because of intelligence and talent. My spouse was also granted ingress the same way.

Although fourth-dimensioners can come and go from the third dimension as I often do to visit my in-laws, third-dimensioners can't because it takes a toll on their health. Some become crazy; others experience unpleasant sensations like dizziness, extreme fear, aggression, and hallucinations. Although there's not enough research, some medical professionals think inter-dimensional travel disrupts channels in the brain. People from the third dimension recover after a single visit, but not

a second one. I hope you decide to stay here. I will allow you solitude to ponder. Call me when you are ready.

What? ... No; I cannot give you any further information. Oh, I am sure you are very persuasive in your third dimension. You can sell ice to an Eskimo. Well, not here. Once again, I will leave you to ponder. Call me when you are ready. Best Wisdom .

So, you're ready now. Dimwit, you prefer to return to your dim world of three dimensions. Very well then: Goodbye Mr. Smith.



Artwork by: *Indrajit Chowdhury*

আমার এ দেহখানি

অনিল চক্রবর্তী

আমাদের এই শরীরটা যখন ঠিক থাকে তখন তার বিভিন্ন অংশগুলো এমন মিলেমিশে নিজের নিজের কাজ করে যায় যে আমাদের বোঝার উপায় নেই তার ভেতরে কি একটা বিরাট কর্মকাণ্ড নিরন্তর নিঃশব্দে হয়ে চলেছে। মাথা থেকে পায়ের নখের সীমানার মধ্যে দৃশ্য অদৃশ্য চেনা অচেনা কত যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কার নিঃশব্দ পরিচালনায় এই শরীরটাকে জন্ম থেকে অবধারিত মৃত্যুর দিকে ঠেলে ঠেলে নিয়ে চলেছে তার খোঁজ সাধারণত আমরা রাখি না, কারণ তার প্রয়োজন পড়ে না। কথায় বলে না, দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা বোঝা যায় না। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন আমাদের শরীরটা বিভিন্ন ধরনের লক্ষ লক্ষ কোষ দিয়ে তৈরী। সেখানে প্রতিটি কোষের নির্দিষ্ট কাজ পূর্বনির্দ্ধৃত করা আছে; তারা কারও অলিখিত, অকথিত নির্দেশ মেনে রোবটের মত যে যার কাজ করে যায়, যার ফলশ্রুতি হচ্ছে আমাদের এই চলমান শরীর। যেন সারা জীবন ধরে চলিযু একটা নাটকে পর্দার আড়াল থেকে কত অভিনেতা, অভিনেত্রী অভিনয় করে যাচ্ছে, কিন্তু নট, নটী বা পরিচালকের দেখা পাওয়া যাচ্ছে না।

প্রথমে আমাদের যে অঙ্গগুলো প্রত্যক্ষ তারা আমাদের জীবনে কিরকম প্রভাব ফেলেছে তা একবার ভেবে দেখা যাক। ধরা যাক আমাদের সবচেয়ে বড় অঙ্গ, ত্বকের কথা। সাদা, কালো, বাদামী, পীত ইত্যাদি কত রঙের ত্বকের বৈচিত্র্যই না দেখা যায় জগৎ জুড়ে। তার মধ্যে বিশেষ করে কালোকে সাদা চোখে বা নিরপেক্ষ ভাবে কেউ দেখে না। *Beauty is only skin deep* বলে মনকে প্রবোধ দিলে কি হবে, আমাদের দেশে বিয়ের বাজারে দেখা যায় নিকষ কালো পাত্রেরও চাই গৌরবর্ণা সুন্দরী। সম্ভাব্য পাত্রীর বিজ্ঞাপনে নিতান্ত কালো মেয়েকেও উজ্জ্বল শ্যাম বর্ণ

বলে চালানোর কথা আমরা সবাই জানি। যে সব কালো মেয়েদের প্রতিদিন জীবনে এই অবমাননা সহ্য করতে হয় তাদের কাছে বা তাদের মা বাবার কাছে এটা সামান্য ব্যাপার নয়। কিন্তু পশ্চিমের দেশে দেখুন, শুধু রঙটা কালো বলে ইউরোপীয়ানরা কোথা থেকে এসে সাউথ আফ্রিকার মত একটা বড় দেশের নাগরিকদের কত বছর ধরে দাবিয়ে রেখেছিল। ওদের দেশটাকে গায়ের জোরে দখল করে নিয়ে ওদের দেশে বসেই ওদেরকে হীন জাতি বলে প্রতিপন্ন করল! পৃথিবী জুড়ে আন্দোলন, অর্থনৈতিক অবরোধ এবং বিশ্বের বাজারে একঘরে না করলে এই বৈষম্যমূলক রাজত্ব আরও কত দিন ধরে চলত তার ঠিক নেই। আমেরিকাতে বর্ণবৈষম্য বে-আইনী বলে অনেকদিন স্বীকৃতি পেলেও কালো সাদার ফারাকটা কখনও যায় নি, ইদানীং আরও যেন প্রকট হয়ে পড়েছে।

পরের ধাপে, বহিরঙ্গের যেটা প্রথমেই চোখে পড়ে সেটা হ'ল আমাদের মুখাবয়ব। কথায় বলে না, সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র। গ্রীক রূপকথার হেলেনের কথা ভাবুন – *that face launched a thousand ships!* আগে দর্শনধারীর মাপকাঠিতে মুখের সৌন্দর্যেরই বিচার হয়, তাও বিশেষ করে চোখ ও নাকের গঠন দিয়ে। কবিরা বলেন প্রেমের প্রথম পদক্ষেপ শুরু হয় যখন একজনের নয়ন অন্যের নয়নের নিবিড় ছায়ায় তার মনের কথার কুসুমকোরক খোঁজে। একবার প্রেমে পড়লে চোখ ফেরাবার আর কোন উপায় থাকে না। তাই চোখের বর্ণনায় তাঁরা কত না কথার মালা গোঁথেছেন! মৃগচক্ষু, আয়তলোচন, পদ্মলোচন থেকে হাল আমলের পাখীর নীড়ের উপমা স্মরণ করিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হচ্ছি। আর নাকের বর্ণনার ব্যাপ্তি, খেঁদা ও তীক্ষ্ণানাস থেকে খড়্গানাসা অদ্ভি। সুন্দরীর সংজ্ঞা পৃথিবীর সবদেশে এক না হলেও নারীদের রূপের ক্ষেত্রে উন্নত

পয়োধরা বক্ষ, গুরু নিতম্ব, ও ক্ষীণকটি তাদের সৌন্দর্যের মাপকাঠি বলে ধরা হয় পৃথিবীর সর্বত্র। এতে অধর ও ওষ্ঠের ভূমিকাও কম নয়। তবে তাদের বর্ণনায় লাল রঙের ওপর পক্ষপাতিত্ব করা হয়েছে - তাই বিশ্বাধরোষ্ঠি ও ডালিমের উপমার প্রয়োগ সাহিত্যে বিশেষ প্রচলিত। সৌন্দর্যের নিরিখে চুলের অবদানও কিছু কম নয়। কুণ্ডিত মেঘবরণ কেশদাম-ভরা সুন্দরীকে কে না চায়! এটাতেই শেষ নয়। পুরুষের চোখে মনোলোভী করার জন্য দেশে দেশে নারীরা কতই না নিগূহীত হয়েছে! চীন দেশে কিছুদিন আগেও খর্বাকৃতি চরণ লাভের জন্য ছোটবেলা থেকেই মেয়েদের পা গুলো আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখা হ'ত। আর আফ্রিকাতে অনেক উপজাতি মেয়েদের অস্বাভাবিক ও যন্ত্রণাদায়ক উপায়ে কর্ণ ও ওষ্ঠের দৈর্ঘ্য বাড়িয়ে সুন্দরী বানিয়ে তোলার প্রথা এখনও বিদ্যমান।

সাহিত্যে পুরুষদের সৌন্দর্যের বর্ণনায় খানিকটা কার্পণ্য লক্ষ্য করা যায়। উন্নতললাট, আজানুলম্বিত বাহু ও ব্যঙ্গকর এরকম কয়েকটা শব্দের কথাই মনে করতে পারছি। ফ্লোরেন্সের মাইকেল এঞ্জেলোর পাথরের তৈরী ডেভিডের প্রতিমূর্তি, যাকে সুপুরুষ অবয়বের প্রতিভূ বলে ধরা হয়, তার মধ্যে এই তিনটে উপাদানকেই দেখতে পাওয়া যায়।

এর থেকে আমাদের বহিরিন্দ্রিয়গুলি আমাদের জীবনে কত সচেতন প্রভাব ফেলেছে তা প্রতিভাত হচ্ছে। কিন্তু যুগ যুগ ধরে ত্বকের সামাজিক ও রাজনৈতিক ভূমিকার কথা বিচার করলে অন্যান্য অঙ্গের অবদান নিতান্তই গৌণ হয়ে পড়ে। সাদা কালো চামড়ার এই যে পৃথিবী জোড়া বিভেদ সেটা এখনও মুছে যায় নি এবং কখনও যাবে বলে মনে হয় না।

অথচ আমরা ভুলে যাই যে *beauty is only skin deep* বাক্যটির মধ্যে একটা গূঢ় সত্য নিহিত আছে। কারণ ত্বক দিয়ে ঢাকা অন্তঃস্থ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি সব মানুষের মধ্যেই এক। সবার শরীরে প্রতিটি কোষকে বাঁচিয়ে রেখেছে নিরন্তর প্রবাহিত এক রক্তস্রোত। উত্তর মেরুর এক্সিমো থেকে দক্ষিণ গোলার্ধের অস্ট্রেলিয়ার যে কোন উপজাতির ধর্মীর মধ্যে যে রক্ত বয়ে চলেছে তার রঙ সবার মধ্যেই লাল। "Blue blood" কথাটি কিছু বর্ণ-সচেতন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি কাল্পনিক কথা মাত্র। তাই রক্তব্যাঞ্জে গচ্ছিত অন্যের দান করা রক্ত যখন অন্য একজনের শরীরে সঞ্চালন করা হয় তখন শুধু রক্তের টাইপের সামঞ্জস্য দেখেই করা হয়। দাতার গায়ের

রঙ বা জাতির প্রশ্ন সেখানে অবাস্তব।

এই সতত সঞ্চালমান রক্তধারাকে যে অঙ্গটি নিয়ত প্রবাহিত করে রেখেছে তাকে গ্রাম্য ভাষায় বলে কলিজা, শুদ্ধভাষায় হৃৎপিণ্ড; আর সাহিত্যের ভাষার হৃদয় অথবা হৃদির মধ্যে হয়ত এর কিছু অনুরণন পাওয়া যেতে পারে। সে এক প্রায় নিরব কর্মী। জন্মের মুহূর্ত থেকে মৃত্যুদিন পর্যন্ত প্রতিদিন ধুকধুক করে নিঃশব্দে যে কাজ করে যাচ্ছে তার অস্তিত্বের কথা আমরা প্রায় ভুলেই যাই। যদি না কোন কারণে হঠাৎ বলমল করে ওঠে চিত্ত! তখন বুকের ধুকপুকুনির মধ্যে দিয়ে সে জানান দিয়ে যায়, আছি, আমি আছি। সাহিত্যিকরা এই অঙ্গটির প্রতি বিশেষ পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছেন; এটাকে তারা কত না নামে ডেকেছেন! তাদের বর্ণনায়, সুখে আমাদের হৃদয়ের এ কূল ও কূল দু কূল ভেসে যায় আর দুঃখে হৃদয় হয় বিদীর্ণ। অ্যারিস্টটল তো এই অঙ্গটিকে মনে করতেন জীবনের কেন্দ্রবিন্দু, চোখের অন্তরালে থাকলেও একে দিয়েই আমাদের পরিচয়। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসম্ভার থেকে এই শব্দটাকে বাদ দিলে তাঁর সাহিত্যের পৃষ্ঠাসংখ্যা কমিয়ে অর্ধেক না হলেও নিদেন পক্ষে এক-চতুর্থাংশ করা যেত! দয়ালু লোকের পরিচয় দেওয়া হয় হৃদয়বান বলে আর যে নির্মম সে হ'ল হৃদয়হীন। কিন্তু আজকাল তো একজনের হৃৎপিণ্ড আরেকজনের শরীরে প্রতিস্থাপন করা হচ্ছে নিয়মিত। তা বলে সেই হৃদয়গ্রাহীর (?) চরিত্র যে বদলে যাচ্ছে তা তো নয়। মনে হয় বিগত যুগে আমাদের সীমিত জ্ঞানের জন্য এই অঙ্গটির মানসিক ভূমিকাকে করা হয়েছিল অতিরঞ্জিত। শরীরের আর পাঁচটা অঙ্গের মত এটাও কাজ করে যাচ্ছে, যদিও তার ভূমিকা খুবই মুখ্য। আমাদের শরীরের আরও যে সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কথা রইল অকথিত তাদের কারও একটির স্বাভাবিক চলায় একবার বাধা পড়লে শরীরে তার বিরূপ প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে আমরা সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারি কারও গুরুত্ব কম নয়।

আমাদের শরীরের দৃশ্য, অদৃশ্য সব অঙ্গকে যে চালিয়ে বেড়াচ্ছে তা যে মাথা তা একটা প্রচলিত ও পরীক্ষিত সত্য। তাই বোধ হয় এর অবস্থান সবার ওপরে। এর অন্তঃস্থিত মস্তিষ্কের মহলে মহলে মুহূর্তে মুহূর্তের ক্রিয়াকলাপ প্রকাশ পাচ্ছে আমাদের কথাবার্তা, বুদ্ধি, বৃত্তি, ভয়, ভালবাসা, স্মৃতি ইত্যাদি অনুভূতির মধ্যে দিয়ে। মাথা দিয়েই আমাদের পরিচয়। তাই গর্বেরে আমরা মাথা উঁচু করে চলি, লজ্জায়

হয় আমাদের মাথা নীচু আর বিজীতদের মাথার ওপর পা দিয়ে আমরা জাহির করি আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব। তবে এটা ঠিক যে কি ভাবে কাজ করে, সেটা এখনও অনেকটাই অজানা। যদিও বহুদিনের গবেষনার ফলে বৈজ্ঞানিকেরা আস্তে আস্তে অনেক রহস্যের সমাধান করতে সক্ষম হচ্ছেন। মনোবিকলন থেকে মাথাধরার গতিপ্রকৃতি মস্তিষ্কের কোথায় কিভাবে নির্ধারিত হচ্ছে তার কিছু কিছু হদিশ মিলছে। তাঁরা আশা করছেন, অদূর ভবিষ্যতে হার্টের মত মস্তিষ্কেরও কিছু কিছু অংশেরও প্রতিস্থাপন করা যাবে অনায়াসে।

কিন্তু এখানেই হচ্ছে সমস্যা। মানুষের ব্যক্তিত্ব, চরিত্র, মানসিকতা সবই নির্ধারিত হচ্ছে তার মস্তিষ্কের গঠনের ওপরে। এর বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক সম্পর্ক এত নিবিড় যে এর কোন অংশকে কোনভাবে বদল করলে তার প্রতিক্রিয়া যে কি হবে সেটার ধারণা এখনও খুব স্বচ্ছ নয়। এই প্রসঙ্গে আরও একটা প্রশ্ন এসে যায়। মানুষের মন, তার অবস্থিতি কোথায়। এটা যে শরীরের অন্য অঙ্গ-নির্ভরশীল নয় তার প্রমাণ আর প্রয়োজন হয় না। *A Short History of Time* এর লেখক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক *Dr. Stephen Hawkin* কিংবা *Superman*-খ্যাত *Mr. Christopher Reeves* (যতদিন *Mr. Reeves* বেঁচে ছিলেন) বহুকাল ধরে বাক ও চলৎশক্তিহীন হয়ে থাকলেও তাঁদের বুদ্ধিবৃত্তি, স্মৃতি ও চিন্তাশক্তি, যেগুলোকে সামগ্রিক ভাবে বলা হয় মন, সেটা মোটামুটি সবই রয়ে গেছে অটুট। এর থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে মনের ব্যাপারে মস্তিষ্কের একটা অপরিহার্য অবদান আছে নিশ্চয়। অনেকের ধারণা, মন কিন্তু মস্তিষ্কের বেড়াজালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। তাদের মতে শরীরের প্রতিটি কোষ কাজ করে এক একটা স্বাধীন রোবটের মত। ভেতর বা বাইরে থেকে কোন রকম সাড়া (*stimulus*) পেলে এই কোষেরা *electrochemical* এর যৌগিক প্রক্রিয়ার ভেঙ্কিবাজি লাগিয়ে যথোপযুক্ত প্রতিক্রিয়া ঘটায় শরীরে। এভাবেই শরীরের সহজ থেকে জটিল ক্রিয়াকর্ম নিরন্তর নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে বলেই তাদের ধারণা। কিন্তু যমরাজার সবচেয়ে দ্রুতগামী কি প্রশ্নের উত্তরে, যুদ্ধিষ্ঠির যে মনকে চিহ্নিত করেছিলেন, সেই মনটার কি শুধু এভাবে ব্যাখ্যা করা যায়? মনে আছে, বেশ কয়েক দশক আগে আমার ইংল্যান্ডে থাকাকালীন *British Broadcasting Corporation (BBC)* *What is Mind* বলে টেলিভিশানে দেখানো একটি আলোচনা চক্র দেখার সুযোগ হয়েছিল। কয়েক দিন ধরে

চলা এই বিতর্কের আসরে পৃথিবীর বহু নামীদামী বৈজ্ঞানিক জড়ো হয়েছিলেন। অনেক আলোচনার শেষে দেখা গেল আমন্ত্রিত অতিথিরা মোটামুটি দুভাগে ভাগ হয়ে গেছেন। একদলের মতে, পদার্থ ও রসায়ন বিদ্যা প্রয়োগ করে শরীর ও মনের সব কিছু ব্যাখ্যা করা সম্ভব। প্রতিযোগী দলের বক্তব্য - এর উত্তর শারীরবিজ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে ভুল হবে, উত্তর শুধু হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনোখানে। এর স্বপক্ষে তারা দারণ এক বাণ ছাড়লেন। *Royal College of Nursing* এ বহুদিন কর্মরতা অভিজ্ঞা এক নার্সকে সবার সামনে স্টেজের ওপর এনে তার ডান হাতটা বরফ-ভর্তি এক বালতির মধ্যে ডুবিয়ে দেওয়া হ'ল। কিছুক্ষণ বাদে তার মুখচোখ দেখে পরিষ্কার বোঝা গেল তিনি খুব যন্ত্রণা পাচ্ছেন। তিনি কবুলও করলেন, এ যন্ত্রণা প্রসব যন্ত্রণার থেকেও অনেক বেশী কষ্টকর। *pain* এর মাত্রা বোঝবার উপায় হ'ল সঙ্গে সঙ্গে রক্ত পরীক্ষা করা; দেখা গেল নার্সের অবস্থাটা খুবই যন্ত্রণাকর। কিছুক্ষণ পরেই একজন *hypnotist* তাকে না ছুঁয়ে শুধু তার সম্মোহন বিদ্যা প্রয়োগ করে নার্সটিকে বোঝালেন যে তার ডান হাতটি আর নেই। ব্যাস, কয়েক মিনিটের মধ্যেই তিনি সম্পূর্ণ যন্ত্রণা মুক্ত, যদিও তার ডান হাত তখনও বরফ-ভর্তি বালতির ভেতর। রক্তের মধ্যেও তার স্বীকৃতি পাওয়া গেল। এই প্রতিপক্ষীদের বক্তব্য, যে মনটা কোন বাহ্যিক *physical stimulus* ছাড়াই শুধু *hypnotist* এর মৌখিক নির্দেশ মেনে এক অতীন্দ্রিয় সঙ্কেতের সাহায্যে শরীরের একটা অঙ্গকে সাময়িক ভাবে বিকল করে দিতে পারে, সেটা শুধু *electrochemical process* এর মাধ্যমে কাজ করে, এটা ধরে নেওয়া ভুল হবে। এর মধ্যে নিশ্চয় আরও কিছু ইন্দ্রিয়াতীত রহস্য আছে। তাদের মতে রক্তে-মাংসে গড়া এই খাঁচার মধ্যে মনের মত অচিন পাখি ক্যামনে আসে যায় তার হদিশ আমরা এখনও পাইনি আর হয়ত কখনও পাবও না। দিনের শেষে *the twain never met*। জীবনের অনেক রহস্যের মত এটাও অমীমাংসিত রয়ে গেল।

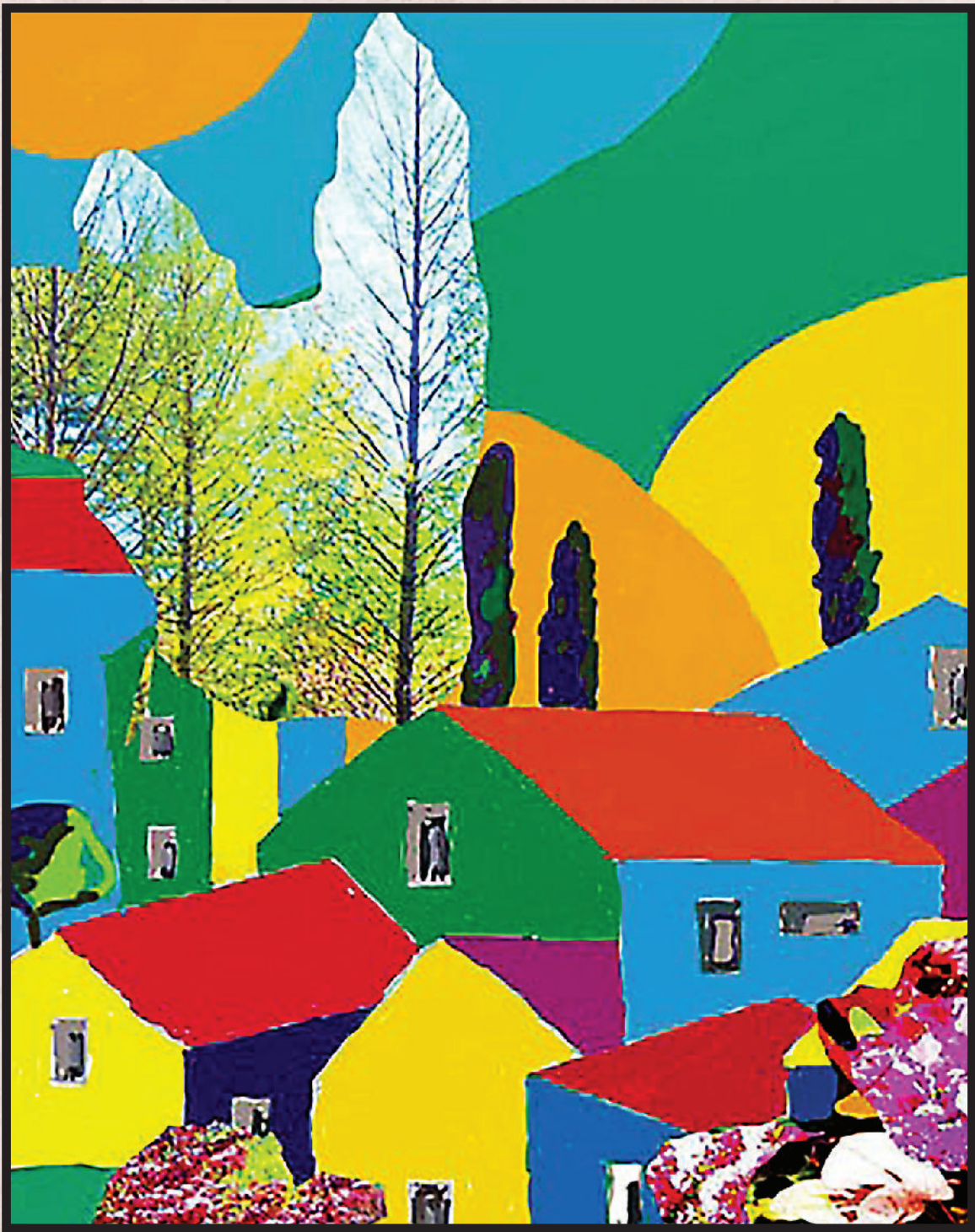
এই প্রসঙ্গে, আমাদের মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপের একটা রহস্যঘেরা প্রতীক্ষা অভিজ্ঞতার কথা না লিখে পারলাম না। তখন আমি ইংল্যান্ডে, সালটা বোধ হয় হবে ১৯৬৮। আমার অফিস থেকে *IEEE*-র এক *Conference* এ আমাকে প্রতিভূ হিসেবে পাঠিয়েছিল। তখনও ব্যাঙ্কে হাতে লেখা চেকের পেছনের সই মিলিয়ে টাকা দেওয়া হ'ত। সব

ব্যাঙ্কই চেষ্টা করছিল সেই মেলানোর ব্যাপারটা *computer* এর হাতে তুলে দিয়ে *teller* এর সংখ্যা কমিয়ে ফেলতে। কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল ব্যাপারটা অত সহজ নয়। বিভিন্ন জনের হাতের লেখার বৈচিত্র্য সত্ত্বেও আমাদের চোখ বলে দিতে পারে সেইটা ঠিক কিনা, মেশিনের সেই সক্ষমতা তখনও হয় নি, কারণ *computer* এর *memory power* ছিল খুবই সীমিত। হাতের লেখায় প্রতিটি অক্ষরের আঁকিবুকের ভিন্নতার *roadmap* না থাকার জন্য এই প্রচেষ্টা তখনকার মত ব্যর্থ হয়। এই *conference* এর *topic* ছিল *computer* কেন সেই চিনতে পারে না তার কারণ অনুসন্ধান করা। আর মজার ব্যাপার হ'ল, বক্তা যিনি তিনি *computer field* এরই ন'ন, তিনি একজন মনোবিদ। তিনি শ্রোতাদের দিয়ে দুটো পরীক্ষার মাধ্যমে বুঝিয়ে দিলেন আমরা চোখ দিয়ে যা দেখি বা কান দিয়ে যা শুনি তা শুধু চোখে প্রতিফলিত ছবি বা কানে শোনা শব্দের ছবছ প্রতিফলন নয় - প্রতিটি দৃশ্য বা শব্দকে বোধগম্য করার জন্য দেখা বা শোনার বাইরেও মস্তিষ্কের অতীন্দ্রিয় কোন চেতনা কিছু সম্পূরক যোগ করে দেয়। এখানেই মস্তিষ্কের সঙ্গে *computer* এর তফাৎ। পরীক্ষা দুটো এই রকম - আমাদের বলা হ'ল, প্রত্যেকের সামনের টেবিলে একটা চোঙার মত জিনিস দিয়ে টেবিলে রাখা কাগজে আঁকা একটা দুবালু ত্রিভুজের (*truncated triangle*) দিকে একমনে চেয়ে থাকতে। প্রথম প্রথম দুটো

বালুই শুধু দেখছিলাম, শেষের দিকে মনে হ'ল সম্পূর্ণ ত্রিভুজটাই যেন দেখতে পেলাম অর্থাৎ কোন এক অদৃশ্য হাত যেন দু-লাইনের তলার দিকটা একটা লাইন ঐকে জুড়ে দিয়েছে। পরের পরীক্ষায় আমাদের সবাইকে একটা করে হেডফোন দিয়ে বলা হ'ল আমরা যেন নিজের নিজের সীটে একদম নড়াচড়া না করে স্পীকারে যে শব্দটা বার বার শোনানো হবে সেটার দিকে মনঃসংযোগ করি। কথাটা ছিল *kettle* - বার বার এই একটা শব্দই শোনা যাচ্ছিল; খানিকক্ষন বাদে সবাই *kettle* এর সঙ্গে মিলিয়ে অন্যান্য অর্থহীন শব্দ, যেমন *suttle*, *futtle*, ইত্যাদি স্পষ্ট শুনতে পেল। তার মানে কি হতে পারে যে আমাদের মস্তিষ্কের গহনে দেহাতীত কোন সত্ত্বা ঠিক করে দিচ্ছে আমরা কি দেখব, কি শুনব!

মনের মত দেহ-সম্পর্কিত, কিন্তু দেহাতীত একটি শব্দের কথা না বললে এ লেখা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে সেটা হচ্ছে প্রাণ। আমরা মনপ্রাণ দিয়ে কাজ করতে পারি, কিন্তু এই প্রাণের সংজ্ঞা কি? প্রাণবায়ু চলে গেলে প্রাণহীন দেহ পড়ে থাকে *funeral home* এর ক্যান্সেটে শব্দাহিত অথবা কবরিত হওয়ার জন্য। কিন্তু *death certificate* দেখলে দেহেরই কিছু যন্ত্রের বিকলকে দেখানো হয় মৃত্যুর কারণ হিসেবে। তাহলে প্রাণের ছোঁয়া কোথায় পাব? চিরকাল আমার কাছে এই-সব রহস্য আছে নীরব, রুদ্ধ-ওষ্ঠাধর!





Village in Tuscany / *Suhas Sengupta*

The Leh trip

Sheel Chakraborty

Age: 11

July 17, 2017

It was the day for leaving to Leh, which is in Kashmir, India. We were flying from Delhi. I didn't know what it was going to be like in Leh, so though I was curious, I was not much excited. We landed in Leh which had a small airport. Leh is surrounded by tall mountains. It is at 11,000 ft altitude. That is as high as when the Wi-Fi goes off inside a flight. I did not see any trees around me. This is the Himalayan



Landing in Leh

mountain range. This is not the first time I went to Kashmir, but this is the first time I am seeing a place without many trees. We stayed at the Zen Ladakh Hotel at the presidential suite. It is a nice hotel, and had lots of good food. We were asked to relax the whole day so can adjust to low oxygen in the atmosphere.

July 18, 2017

It was the second day of the trip and the first day of sightseeing. We went to see the Sangam Point where the Indus and Zaskar river met. The two rivers were of different colors. My dad said Indus river was the origin of the word India and Hindu. After that we saw the magnetic hill. When our driver stopped the engine of the car, the car moved backward uphill against gravity. It was because of the magnetic pull. From there, we went to see The Hall of Fame. The museum had a lot of guns and weapons. I read about the Kargil war in 1999, in which India won against Pakistan. Also saw lots of tombs of fallen soldiers. There is an Indian flag hoisted on top of a pole.



At Indus River

In the evening, we got to go and see Hemis, a very beautiful Buddhist monastery. It was at the very top of the mountain. We got to go see the life of Buddha. We rotated the prayer cylinders clockwise to pay respect for Buddhism. When we were done with sightseeing, we moved to the family suite, which was very nice. There were two villas, and a living room. My sister and I slept in one villa.

July 19, 2017

It was the third day, and my parents woke me up at 6:00 am. We had a full day of sightseeing. We were going to Pangong Lake, the highest salt water

lake in the world. It is higher than Lake Titicaca in Andes. The lake extends from India to China and is located at a height of 14,000 ft. We went through Changla pass which is the second highest road at an altitude of 17,600 ft. Thinley was our driver. We drove over ice, streams and very bumpy roads. We saw a lot of Indian Army trucks. We also saw dogs, goats and yaks. My sister spotted a groundhog as well. Finally, we reached Pangong after 6 hours of drive.



Kargil War Memorial

The lake was very beautiful but the bathrooms were not good. The color of the lake was blue-green and was constantly changing. There were snow peaks around the lake, some mountains were yellow in color and others were tannish-reddish. We skipped stones in water. We met a 15-year old from Philadelphia, he took a family picture for us.

It was a beautiful place but wow, was it a full day! We came back to the hotel at 5:45 pm. And we were very tired. We took rest at our rooms and yes, I was happy to be back at the hotel.

July 20, 2017

We took the whole day light and in the evening, went to a fort in Leh palace. After that we went to the market. My parents bought some shawls and pashmina. Last, we went to the Shanti Stupa. The sunset was just over. We walked clockwise, and went inside three temples. The place was very nice and beautiful. We came back to the hotel by 7 p.m. We packed our suitcases for the next day return.

July 21, 2017

We left the hotel at 7 a.m. We took Jet Airways flight back to Delhi. I saw a lot of new things during the Ladakh trip and I will surely remember it.



The Leh Place



The Pangong Lake



Yaks on Road



Ready to leave
Bye, bye Ladakh!



বংশমর্যাদা

সঞ্জয় মাইতি



ফেদার ডাস্টারটা হাতে নিয়ে আনমনা, নিষ্পলক পারমিতা। আজ যেন একটু বেশীই আনমনা। পলকহীন দৃষ্টি একটি ছোট ফুলদানির ওপর। নিতান্তই মামুলি একটি ফুলদানি। তবুও এটি তার বহুসুসজ্জিত ও আভিজাত্যময় মহলে দামী আসবাবপত্রের মধ্যে দিবা স্থান দখল করে নিয়েছে প্রথম দিন থেকেই। তার একটি অন্যতম কারণ বোধহয় এটির অপূর্ব কারুকার্য। বেশ রেকার কালেকশান বলতে গেলে। একটি সাধারণ পোর্সিলিনের ফুলদানির ওপর তামা ও রূপোর তার জড়িয়ে অপূর্ব নক্সা। অনেকটা ডোকরার কাজের মত। কখনই এটি বাড়িতে পার্টি উপলক্ষ্যে আসা অনেক পরিচিতদের গোচর এড়াতে পারেনি। গুণমুগ্ধ দৃষ্টির বহু প্রশংসা কুড়িয়েছে এটি এখন পর্যন্ত। তাকিয়ে থাকতে থাকতে পারমিতার মনটা যেন টাইম মেশিনে চড়ে ফিরে গেল বত্রিশটা বছর আগে।

“বাস স্ট্যান্ড। দাঁড়িয়ে আছি বাসের অপেক্ষায়। হঠাৎই এলে তুমি, যেন দমকা হাওয়ার মত। মিষ্টি স্বরের একটি ছোট প্রশ্ন সব তোলপাড় করে দিলে।

— আচ্ছা এ বাসটা কি যাদবপুর যায়?

ঘাড় নেড়ে সম্মতিসূচক একটা ইঙ্গিত দিলেম মাত্র। রুদ্ধকণ্ঠ, দুরূ, দুরূ বুক। বাড়ি এসে কতক্ষণ চেয়ে রইলাম কড়িকাঠের

দিকে। কানে বেজেই চলেছে সেই মিষ্টি স্বর - বাসটা কি যাদবপুর যায়? এরকম সুখস্মৃতি আমাদের সবারই জীবনে আসে। কি? ঠিক বললাম তো?” অপূর্ব কণ্ঠে এবার গান শুরু হ’ল।

কতবার ভেবেছিলাম আপনা ভুলিয়া,
তোমার চরণে দিব হৃদয় খুলিয়া।

গান শেষ হ’লে সারা প্রেক্ষাগৃহ হাততালিতে মুখর। আহা কি গলা! কি ভূমিকা! অপূর্ব!

পারমিতা তখন প্রথম বর্ষের ছাত্রী। ভ্যালেন্সটাইন ডে উপলক্ষে এই ছোট সন্ধ্যানুষ্ঠানের আয়োজন। এই প্রথম অমিতের গান শোনে পারমিতা। অনুষ্ঠানের শেষে নিজেই গিয়ে বললে - “হ্যালো!” সমাজবিধির পথ গেল খুলে। এরপর ধীরে ধীরে চেনাশোনা ও বন্ধুত্ব। মনে আছে দ্বিতীয় বর্ষের পরীক্ষার আগে মূল বিষয়ের টেক্সট বই জোগাড় করতে যখন প্রায় হিমশিম পারমিতা, তখন অমিতই যেন কোথা থেকে লাইব্রেরীর একটা কপি এনে দিলে। কোনোরকমে পরীক্ষাটা উত্তরে দিয়েই মামাবাড়ি চলে যায় পারমিতা। অসুস্থ হয়ে পড়ায় প্রায় একমাস পরে ফিরে বইটা অমিতকে ফেরৎ দেবার সময় জানতে পারে যে ওটি অমিতের কার্ডেই তোলা। পরীক্ষার দিনে অসহায় বান্ধবীর

উদ্দেশ্যে এই আত্মত্যাগ। তখন থেকেই এটা সেটা ব্যাপারে এ ধরনের ছোটখাট আত্মত্যাগ চলতেই থাকে।

অমিত তখন চতুর্থ বর্ষের ছাত্র। আর পারমিতা তৃতীয় বর্ষের শেষের দিকে। অমিত চাকরী পেল জয়পুরে। হোটেল ম্যানেজমেন্ট পড়ে ছিল অমিত। একটা ফাইভ স্টার হোটেলে ট্রেনী হিসেবে জয়েন করতে হবে। খবরটা দিতে ছুটে এসেছিল বান্ধবীকেই প্রথম। প্রায় হাঁফাতে হাঁফাতে এই প্রথম জানালে তার মনের গোপন কথাগুলি। এতদিনের হৃদয়ের নিভৃতগোপন কথাগুলির মোহময় আবেদন পারমিতাকে নির্বাক করে দিলে। ঠিক হয়েছিল অতি শীঘ্রই অমিত, পারমিতার মা-বাবাকে তার সিদ্ধান্ত জানাতে আসবে। কথা রেখে ছিল, এসেও ছিলো সে। কিন্তু নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের ও তফসীলি সম্প্রদায়ের একটি অতি সাধারণ ছেলে অমিতকে একরকম অপমানিত হ'য়েই শূন্য হাতে ফিরে আসতে হয়েছিল। অমিতের পরিবার ছিল ছত্তিসগড়ের একতাল গ্রামে। একটু বড় হতেই তার আনাগোনা শুরু হ'ল ডোকরা দামার উপজাতিদের সঙ্গে। অমিতের শিল্পী স্বভাব বিকাশ অল্প বয়সেই ঘটে যায়। ছোটবেলাতেই তার ডোকরা শিল্পের ওপর অগাধ টান, ভালবাসা ও নিয়ন্ত্রণ জন্মায়। পরে আস্তে আস্তে সেই শিল্পকে সে নিজের মত করে প্রয়োগ শুরু করে। পারমিতার ফ্যামিলি রুমের এই ফুলদানিটি তারই একটা নিদর্শন। বহু যত্নের সঙ্গে হয়তো এটি বানিয়েছিল সে। এর 'পরে যে কাজটুকু আছে, তা যেন তার বড় আপনার। পারমিতার মনে পড়ে, যে দিন পারমিতার বিয়ে ঠিক হ'ল, তার কিছুদিন পরেই অমিত কনগ্র্যাচুলেশানস্ জানাতে আসে। সঙ্গে এই ফুলদানি। সে দিন থেকেই ফুলদানিটা ঠিক যেন পারমিতার ছায়াসঙ্গী।

আজও সেই দিনের কথাগুলো যেন কানে বাজে পারমিতার। তার বাবার সেই বিদ্রূপাত্মক মন্তব্যগুলি।

— কত টাকা মাইনে পাও? — বংশমর্যাদা সম্পর্কে কোনো ধারণা আছে? — বামন হ'য়ে চাঁদে হাত? — কি আছে তোমার পরিবারের? ইত্যাদি ইত্যাদি। সঙ্কুচিতা পারমিতা সে দিন কোনো কথা বলতে পারেনি। পারমিতার বাবা পরিষ্কার জানিয়ে দেন, তাঁদের বংশে এ হেন কুলহীন ও নিম্নপরিবারের ছেলের সহিত বিবাহ তাঁর পক্ষে অতি দুঃস্বপ্নেও ভাবা অসম্ভব ও অবাস্তব। পারমিতা যেন আজও

অমিতের নিম্নমুখী দৃষ্টি আর নতমস্তকে ধীর পদক্ষেপের আওয়াজ পায় বুকের মধ্যে। অমিত, দাঁড়াও অমিত -

* * *

ক্রিং ক্রিং ক্রিং... ক্রিং ক্রিং ক্রিং...

— পারো, ফোনটা একটু ধর না? আমি ব্রেকফাস্ট খাচ্ছি।

জয়ন্তর গলার আওয়াজে ভাবনার জগতে ইতি পড়ল পারমিতার। জয়ন্ত সেন, পারমিতার স্বামী। একটি মাল্টিন্যাশানাল কোম্পানীর উচ্চপদস্থ অফিসার। বহু বছর হ'ল আমেরিকাতে সেটল্ড। বাড়ি, গাড়ি, বিষয়, বৈভব কোনো কিছুই অভাব নেই। শুধু সময় নামক বস্তুটিরই যা অভাব। এই মুহূর্তে অফিস যাবার জন্য একরকম তৈরী।

— হ্যালো? হ্যালো? হ্যালো?... ফ্যামিলি রুম থেকে কর্ডলেস ফোন হাতে পারমিতা ব্রেকফাস্ট টেবিলে এসে বসল জয়ন্তর মুখোমুখি।

— হ্যাঁ কে? ছোট্টকা বলছো? কি ব্যাপার এত সকালে ফোন করলে?

— অ্যাঁ, বল কি?

পারমিতার কাঁপা কাঁপা গলা। ভয়মিশ্রিত উদ্বেগ চোখের কোণে। জয়ন্ত ব্যস্ত হয়ে জিগোস করলে,

— কি হয়েছে, পারো?

পারমিতা কিছু না বলে ফোনটা এগিয়ে দিল জয়ন্তর দিকে। জয়ন্ত ফোনটা ধরলে সে মাথা নিচু করে করণ স্বরে বলে উঠলে,

— 'ওহ্ মাই গড্'

— হ্যালো, কাকাবাবু বলছেন? কি হয়েছে? এঁ্যা, সে কি? কখন?

প্রায় পৌনে তিন মিনিট চুপ করে শুনল জয়ন্ত। তারপর অসহায়ের মত বলে উঠলে,

— বাপ্পা তার মোবাইলটা ধরছে না?

মিনিট কয়েকের মধ্যেই ফোনপর্ব শেষ। ব্রেকফাস্ট টেবিলে জয়ন্ত আর পারমিতা দুজনেই বসে মূহ্যমান। নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে জয়ন্তই বললে,

— আমাদের এক্সুগি ইন্ডিয়া যেতে হবে।

পারমিতার ক্রন্দনপ্রায় আর্তি,

— বাপ্পাটা যে এখন কি করছে! কোথায় যে আছে! কেমন আছে!

বাপ্পা, ভাল নাম অনিন্দ্য। জয়ন্ত ও পারমিতার একমাত্র সন্তান। আজ পাঁচদিন হ'ল মুম্বাইতে গেছে অফিসের কাজে। মেরিল্ লিঞ্চ এর ভেঞ্চার ক্যাপিট্যালিস্ট গ্রুপের ম্যানেজিং ডিরেক্টর সে। খুব অল্প বয়সেই কর্পোরেট ল্যাডারে দ্রুত গতিতে ওঠা। এ ব্যাপারে অবশ্যই জয়ন্ত আর পারমিতার বেশ খানিক গর্ব। কর্মসূত্রে সারা পৃথিবীতেই তার প্রায়শঃ বিচরণ। গতকালই বাপ্পার সঙ্গে কথা হয়েছে পারমিতার। আর আজই এই দুঃসংবাদ। ছোট্টকা জানালেন - গত রাতে নাকি মুম্বাই এর প্রখ্যাত ল্যান্ডমার্ক 'তাজ' হোটেলে সম্ভ্রাসবাদীদের হামলায় বোমা বিস্ফোরণ ঘটেছে। খবরটা শোনামাত্রই জয়ন্ত টিভি খুলে দিয়েছে। সব নিউজ চ্যানেলেরই 'ব্রেকিং নিউজ'। বাপ্পা যে ওই হোটেলটাতেই আছে। এটা ভেবেই পারমিতার মাথা ঘুরতে থাকে।

প্রায় আধঘন্টা ধরে বাপ্পার মোবাইলে আশ্রয় চেষ্টা করেও কোনও ফল হ'ল না। নিকটাত্মীয়দের মধ্যে পারমিতার ছোট্টকা থাকেন মুম্বাইতেই। উইকএন্ডের বেশ কিছুটা সময় বাপ্পা কাটিয়েও এসেছে ওনাদের সঙ্গে। হোটেলের মেইন নাস্তারটা এখন যথারীতি সুইচ্ছ অফ।

— চল না, আমরা এক্সুগি ইন্ডিয়া চলে যাই! - পারমিতা বলে উঠল।

— সেই ভাল। দেখি টিকিট পাওয়া যায় কি না।

তারপর চলল অবিশ্রাম প্রয়াস। যদি কেনো রকমে টিকিট পাওয়া যায়। লাভ হ'ল না। এরই মধ্যে বেশ কয়েকবার ছোট্টকার সঙ্গে কথা বলল পারমিতা। এবার বেশ রাত হয়ে যাচ্ছে, আর বোধহয় বেশীক্ষণ ছোট্টকাকে ফোন করা ঠিক হবে না।

* * *

— 'মে আই কাম ইন্ স্যার?'

আই-প্যাডটা স্ট্যান্ডে রেখে পারমিতার সঙ্গে ভিডিও চ্যাটে মশগুল বাপ্পা। দরজায় টোকা, আর শুনতে পেল কার জানি গলা।

দু বছর আগের কথা। স্থান, একই - সেই 'তাজ' হোটেল। প্রথমবার একা অফিসের কাজে এসেছে মুম্বাই। চেকিনের সময় বেশ আশ্চর্যভাবেই আলাপ হয়ে গেল হোটেলের ম্যানেজারের সঙ্গে। নাম দেখে জিগ্যেস করলেন - বাপ্পা নিশ্চয়ই বাঙ্গালি। আর তার সঙ্গে বললেন, তিনিও একজন বাঙালি। তবে বাপ্পা আগোভাগেই বলে নিলে যে তার বাংলা কিন্তু ভাঙ্গা ভাঙ্গা। এর সঙ্গে বাপ্পা এও জানিয়ে দিল যে তার একটি জরুরী কুরিয়ার আসার কথা ডিরেক্টলি হোটেলের অ্যাড্রেসে। পাওয়ামাত্র যেন তাকে জানান হয়। ম্যানেজার সহেব বাপ্পাকে আশ্বস্ত করে বললেন,

— আমি নিজে গিয়ে দিয়ে আসব, আপনার ঘরে।

মাকে মিউট করে হোল্ড করতে বলে উঠে গিয়ে দরজা খুলল বাপ্পা। ম্যানেজার সাহেব। হাতে ডি. এইচ. এল. এর একটা প্যাকেট। বাপ্পা ধন্যবাদ জানাল। হঠাৎ আই-প্যাডের দিকে চোখ পড়ল ম্যানেজারবাবুর। জিগ্যেস করলেন উনি কে হ'ন বাপ্পার। বাপ্পা বললে - মা। ম্যানেজারবাবুর ছোট্ট উত্তর - বাঃ!

বাঙ্গালি বলেই বোধহয় ম্যানেজারবাবুর সঙ্গে বাপ্পার বেশ একটা ভিন্ন সম্পর্ক গড়ে উঠল। গত দু বছরে বেশ কয়েক বার এসেছে সে। প্রতিবারেই অনুভব করেছে ম্যানেজারবাবুর বেশ একটা গভীর আন্তরিক সম্পর্ক।

* * *

এক একটা প্রহর যেন এক একটা দিন জয়ন্ত আর পারমিতার কাছে। সারাদিন ধরে সব টিভি চ্যানেলগুলোতে দেখিয়ে যাচ্ছে হতাহতের আনুমানিক পরিসংখ্যান, হস্টেজের খবরাখবর। যে কোনো এয়ারলাইনে টিকিট পাওয়া যেন লটারি জেতার সমান। শোনা যাচ্ছে যে হোটেল স্টাফদের মধ্যে বেশ কিছু হতাহতের খবর মিলেছে। কয়েকজনের

অবস্থা বেশ আশঙ্কাজনক। রাতটা যে কি ভাবে কাটবে জয়ন্ত আর পারমিতা ভেবে উঠতে পারল না। শুধু রাত কেন, এ ভাবে আরও দেড় দিন কেটে গেল। বাপ্পার খবর মেলেনি এখনো। স্থানীয় খবর অনুযায়ী যে কোনও সময়ে পুলিশ অবস্থা আয়ত্তে এনে ফেলবে বলে আশা প্রকাশ করেছে। এ দু দিন ফোন বেজেই চলেছে - হয় বন্ধুবান্ধব, নয়তো আত্মীয়স্বজন, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে।

আবার ফোন বেজে উঠল। কলার আই. ডি. বলছে আন্নোন্ নাস্তার। কিন্তু কান্ট্রি কোড ইন্ডিয়ায়। জয়ন্ত তাই দ্বার সহিতই ফোন ধরল।

— হ্যালো...

— কে বাপ্পা? কিরে কেমন আছিস?

জয়ন্ত আর পারমিতার চোখে জলের ধারা যেন বাঁধ মানতে চায় না।

— আমি ভাল আছি ড্যাড, তবে খুব টায়ার্ড। হাউ ইস মম?

— আমরা ভাল আছি রে। তোরই খবরের প্রত্যাশায় ভয়ঙ্কর দুশ্চিন্তায় ছিলাম।

জয়ন্ত ফোনটা স্পীকারে দিল।

— প্রায় দু দিন লুকিয়ে ছিলাম হোটেলের একটা চোরাকুঠুরীতে। এখানেরই কিচেন সাপ্লায়ের স্টোরেজের পেছনে। - বাপ্পা বলেই চলে - দ্যাট গ্রেট ম্যান সেভ্‌ড্‌ মাই লাইফ।

— হু ইজ্‌ দ্যাট্‌ ম্যান? - পারমিতা শুধায়।

— মা, তোমাকে হোটেলের ম্যানেজারের কথা বলেছিলাম আগে?

— না তো!

— হি লাইক্‌স্‌ মি ভেরি মাচ্‌ ফ্রম্‌ ডে ওয়ান। হি ইজ্‌ এ বেঙ্গলি টু। মনে হয় উনি আমাকে ভালবাসেন। হি বেট্‌ হিজ্‌ লাইফ, টুক্‌ আ হিউজ্‌ রিস্ক্‌ আর আমাকে এনে এখানে ঢুকিয়ে দিল। জানিনা উনি এখন কোথায়।

— কি নাম বললি? অমিত বাসু? ওনাকে বলিস যে উই আর অল্‌ এক্সট্রিমলি গ্রেটফুল টু হিম্‌।

* * *

আজ চারদিন পরে প্রথমবার ফোন এ যোগাযোগ করতে পারল পারমিতা, হোটেলের সঙ্গে। এ কদিন একটি নামই ঘুরপাক খাচ্ছে পারমিতার মনের মধ্যে। ‘অমিত বাসু’। পারমিতা ফোনটা ধরেই আছে। ডাকতে বলেছে ম্যানেজারকে। পারমিতা নিজের বুকের ধুকপুকানি শুনতে পাচ্ছে। এলোপাথাড়ি চিন্তার স্রোত তার মাথার মধ্যে।

— হ্যালো।

— আমি, আমি... পারমিতা, তোমার মিতা।

— মিতা, কেমন আছ? কেমন চলছে সংসার?

— ভাল, আর তোমার?

— যেমনটি চলার, ঠিক তেমনই।

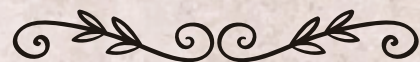
— বন্ধু, তুমি শুধু দিয়ে যাবে আর আমি শুধু নিয়ে যাব তা তো হতে পারে না...

আবার ভাবনার ধারায় ব্যাঘাত ঘটল। ও পার থেকে একটি অপরিচিত কণ্ঠস্বর ভেসে আসে।

— আপনি কি অমিত বাসুর কোনো নিকটাত্মীয়? ওনার তো কোনো নিকটাত্মীয় ছিল বলে জানতাম না। অ্যাট লিস্ট আমাদের ফাইলে সে রকম কোনো রেকর্ড নেই।

— না, আমি ওনার এক ঘনিষ্ঠ বান্ধবী। ওনার সঙ্গে কি একটু কথা বলতে পারি?

— খুবই দুঃখিত, ম্যাডাম। তা আর কোনোদিনও পারবেন না। দুদিন আগে হলেও হয় তো পারতেন।



Creating fulfillment in life

Abir Guha Thakurta



I came to work for Haverty's two years back and more than a satisfying experience, it has been a humbling experience. Working with every team member has been enlightening - and today as I sit on the beach reviewing our Labor Day Sales, I am reminded of George (changed for privacy

reasons) who works in our Eastern Distribution Center in Braselton, delivering furniture to our customer's homes. George has been at it for 35 years and his enthusiasm remains the same. When I asked him, what keeps him going at such a challenging and difficult job (try lifting furniture for that many years and dealing with customers and you will understand); he mentioned, "I just love doing it". For 35 years, he has been delivering furniture.

I was not satisfied with his simple five-word answer, so I kept probing. Why would someone love delivering furniture for 35 years? It turns out, that delivering furniture is a complex business. If done properly, it requires a deep understanding of the customer's house, the obstacles to delivery and ultimately ends in a fulfilling experience when all is done. George didn't love delivering furniture, ultimately, he loved serving the customer and

making her dream project come true. He loved being a part of the customer experience and the fulfillment she got when her dream furniture was being delivered by him. He loved connecting with the customer as she told him stories about the rooms he was furnishing. He loved showing them

how to make the room better. He loved being a designer at heart. He could have become a designer, a furniture expert, but he chose to do what he was doing - he chose to be with the customer; he chose to be a small part of her dreams. He loved fulfilling her dreams.

He was not just a happy man, he was a fulfilled man.

Every one of us has a deep-seated purpose, cause or belief that is the source of our passion and inspiration. We may not yet know what ours is or how to express it in words. But we all have one. All of us deserve to live as George does: waking up inspired to go to work and coming home, at the end of the day, feeling fulfilled by the work we do. Fulfillment isn't another word for happiness. All kinds of things make us happy at work: hitting

a goal, getting a promotion, landing a new client, completing a project — the list goes on. But happiness is temporary; the feeling doesn't last. Nobody walks around energized by the memory of a goal hit twelve months back. That intensity passes with time.

Similarly, in our personal and community life, all kinds of things make us happy: going to a festival, being a part of a drama, wearing beautiful sarees, eating "Mangsho" at Durga Puja, or just hanging out with friends through eternal rounds of "Adda" - but all these are just moments of happiness. they disappear as quickly as they come; and the memories wash away as fast as the Facebook posts disappear.

None of the above is fulfilling.

Fulfillment is deeper. Fulfillment lasts. The difference between happiness and fulfillment is the difference between liking something and loving something. We don't necessarily like our kids all the time, for example, but we do love them all the time. We don't necessarily find happiness in our jobs every day, but we can feel fulfilled by our work every day if it makes us feel part of something bigger than ourselves. We don't go to all our community events; we don't befriend every one of our community members, but we find it eternally fulfilling to serve our community in ways we didn't envision and bond with everyone who feel the same.

That's the reason we can feel unfulfilled even if we're successful by standard measures like compensation and status. Fulfillment comes when our job connects directly to our passion. That's the reason why becoming a part of the executive committee at a community event does not leave us fulfilled. It comes from our love for serving people in ways we

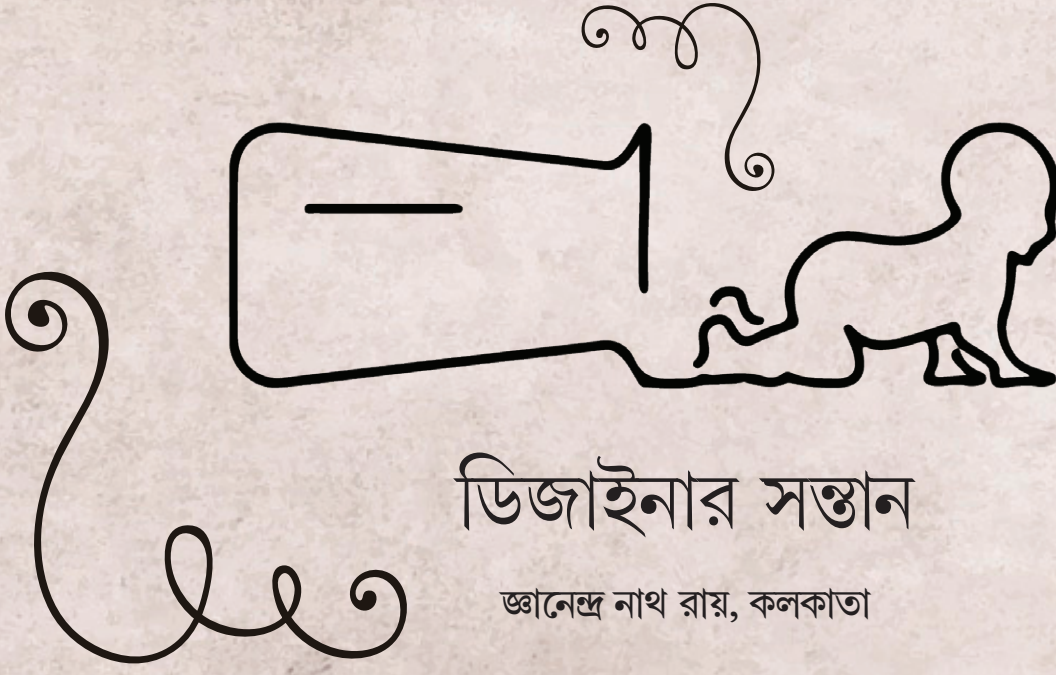
don't normally do.

Happiness comes from what we do. Fulfillment comes from why we do it.

I have the biggest teacher right next to me who exemplifies that - my wife, who could have done so much, yet chose to reward her life by imparting kids her love and passion for dance. As an accomplished artist in India under her guru, there was a lot to achieve and conquer in the world of dance. The admiration and adulation she had received every continent she went to, was enough to deter anyone from changing the course of his or her life. Yet she chose to be with me and become a teacher. She chose to teach the beautiful art of dance to such a wonderful group of passionate and eager young women. She got to instill a deeper purpose than just teaching a few dance steps or doing programs. She finds it deeply fulfilling to work with students, think of them as her own, and play a part in their wonder years as they fly away to lead their own lives. She chooses to do it not because she wants the money, the fame, awards, recognition or the big business everyone cares for. She chooses to do it because it is fulfilling for her to transform these kids into strong leaders of the art form.

Like so many others, I once viewed the sources of happiness and fulfillment in my life as events that were few and far between. I'd have some good days here and there, but they were mostly based on what didn't go wrong at work, at home, or with my finances. As I sit on the beach thinking about what I have achieved and what I hope to get to in the next decade, it's time, I calibrated my life with more fulfillment than moments of happiness. And this is a promise I intend to keep.





ডিজাইনার সন্তান

জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়, কলকাতা

সন্দেহটা প্রথম জন্ম নেয় লীনার মনেই। ওর দুটো সন্তান। তাই ছেলে মানুষ করার অভিজ্ঞতা ওর বেশ ভালই। অভিলাষ অর্থাৎ অভির দেখাশুনোর জন্য লীনাকে নিযুক্ত করা হয়েছে। বছর দু'য়েকের অভি কিন্তু বেশ ঝকঝকে ও সুন্দর। হাত পা সুডৌল এবং চেহারাটা বেশ ভাল। দেখলেই আদর করতে ইচ্ছা করে। কিন্তু, কয়েকদিন ধরে লীনা লক্ষ্য করছে যে অভি ঘরের এক কোণে বসে খেলাধুলো করতে বেশি ভালবাসে। ঐ ঘরে কেউ ঢুকলে সেখান থেকে সরে গিয়ে অন্য কোনও ঘরে চলে যায়। অভি বেশ চুপচাপ আর শান্ত, কাউকে বিরক্ত করে না। তাতাইে দিদির সঙ্গেও খুব একটা মেশে না বা কথা বলে না। অন্যরা কথা বলার সময় যেমন চোখে চোখ রাখে অভি সে রকম করে না। মাথা নিচু করে থাকে। প্রশ্নের উত্তর ঠিকমত দেয় না। লীনা হয়ত জানতে চাইল, কিরে দুধ খাবি? প্রশ্নের প্রতিধ্বনি করে অভিও তখন বলে, কিরে দুধ খাবি? অন্যান্য শিশুরা এমন আচরণ সাধারণত করে না। এ সব লক্ষ্য করে লীনা বেশ চিন্তিত হয়ে পড়ে।

অভিলাষের মা রূপলেখার সময় কাটে তার কলেজ নিয়ে। কলেজে পড়ানোর প্রস্তুতির জন্য বেশ কিছুটা সময় তো তাকে দিতেই হয়। এ ছাড়া খাতা দেখার জন্য তাকে মাঝে মধ্যে ব্যস্ত থাকতে হয়। ছেলের এই শান্ত ভাব লক্ষ্য করে রূপলেখা মনে মনে বেশ খুশি। স্বামীকে একদিন বেশ বড়াই

করে বলেছিল, দেখেছ নীল, অভিটা কী শান্ত, তোমার মতো দুরন্ত নয়, নিজের মনে কী সুন্দর খেলা করে। আর দেখেছ হংকং থেকে তুমি যে খেলনা রোবটটা এনে দিয়েছ সেটা ও একদম ছাড়তেই চায় না। ওটাকে ও খুব পছন্দও করে ও ভালবাসে।

নীলাকাশ রূপলেখার কথাটার কোনও গুরুত্ব না দিয়ে বলে, কিছু মনে কোরো না রূপু, একটা কথা কিন্তু তোমায় না বলে থাকতে পারছি না।

- কী কথা?

- তাতাই যখন ওর মতো ছোটো ছিল তখন তুমি ওর সঙ্গে অনেকটা সময় কাটাতে, ওর সঙ্গে খেলতে, রূপকথার গল্প শোনাতে, কথা বলতে। কিন্তু অভিকে তুমি বলতে গেলে সময়ই দাও না। এটা কিন্তু ঠিক নয়, উচিৎ ও নয়।

নীলাকাশের যুক্তি মেনে নিয়ে রূপলেখা বলে, তুমি, কথাটা ঠিকই বলেছ নীল। তবে আমি কীই বা করতে পারি বল? তাতাই এর সময় কলেজের চাকরিটা তো ছিল না, তাই একটু সময় দিতে পারতাম। এখন তো সময়ের সঙ্গে তাল রেখে আর পেরে উঠি না।

নীলাকাশ তখন রূপলেখাকে চেপে ধরে, তাহলে রূপু, এ

কথা মানছ যে অভিলাষকে তুমি অবহেলা করছ। তোমার কাছে কোনটা বড়? চাকরি না সন্তান?

- সন্তানেরই প্রাধান্য বেশি হওয়া উচিত এবং তা আমি মনে প্রাণে বিশ্বাসও করি, আর সেজন্যই লীনার মতো একজন শিক্ষিত গভর্নেস রেখেছি অভির জন্য। এর থেকে আর বেশি কী করতে পারি বল? তা-ছাড়া...

রূপলেখাকে ইতস্ততঃ করতে দেখে নীলাকাশ প্রশ্ন করে, তাছাড়া কী?

- তাছাড়া সরকারের শর্ত ও প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী অভির ভবিষ্যৎ তো পরিকল্পিত ও সুনির্দিষ্ট। আমাদের কোনও উৎকর্ষ বা উদ্বেগের অবকাশই নেই। শুধু শুধু চিন্তা করছ কেন?

রূপলেখার এই কথাটা নীলাকাশ ঠিক মানতে চায় না। রূপলেখাকে পাল্টা প্রশ্ন করে, তুমি সরকারের শর্ত বা প্রতিশ্রুতি বলতে, ঠিক কী বোঝাতে চাইছ বলতো? অভিলাষের জন্মের ইতিহাসটা তো তোমার জানা। অনলাইনে ভারত সরকারের কাছে যখন তুমি একটা বিশেষ ধরনের পুত্র সন্তানের জন্মের জন্য আবেদন জানিয়েছিলে তখন তুমি উল্লেখ করেছিলে সে দেখতে কেমন হবে, তার বুদ্ধাঙ্ক (IQ) কী রকম হবে এই রকম আরও অনেক কিছু। তাই তো?

- হ্যাঁ, জানিয়েছিলাম, সেই রকমই তো ওরা জানতে চেয়েছিল। তাতে কী হয়েছে?

- সরকার তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর করে তোমার ইচ্ছানুযায়ী এক-দিন বয়সের একটি জন্মের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আমরা তখন আমাদের বন্ধু ডক্টর সামন্তের শরণাপন্ন হলাম। উনি ঐ জন্মটা অতি সযত্নে তোমার গর্ভে স্থাপন করলেন। তোমার অশেষ করুণা যে তখন তুমি সে দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করে সারোগেট মায়ের প্রসঙ্গ তোলো নি। তুমি যদি তোমার জন্মের সেই জন্মটিকে চল্লিশ সপ্তাহ ধরে লালন পালন না করতে তাহলে তো অভিলাষের মতো আদরের দুলালকে কোলে পেতে না। তাই না?

রূপলেখা বলল, দ্যাখো সেটা তো আমার কর্তব্য ছিল। সন্তানকে স্বগর্ভে ধারণ করার মতো তৃপ্তি তো আর কিছুতে

হয় না।

- হ্যাঁ, ঠিক সে কারণেই, তাতাইকে যে ভাবে মানুষ করছ সে ভাবেই অভিকেও মানুষ করা তোমার কর্তব্য। তেমন হলে, চাকরিটা তুমি ছেড়ে দাও।

- না না ঠিক আছে, তোমার বক্তব্য আমি বুঝতে পেরেছি। চাকরি না ছেড়েও আমি অভিকে আরও বেশি সময় দেবার চেষ্টা করব। তুমি নিশ্চিন্ত থাক, উদ্বেগ কোরো না।

নীলাকাশ খুশি হয়ে বলল, ধন্যবাদ রূপু, এ কথা ভেবে ভাল লাগছে যে তোমাকে আমি সন্তান পালনের গুরুত্বটা বোঝাতে পেরেছি। আমার একটাই প্রার্থনা, এতক্ষণ যা বললে তা যেন তোমার খেয়ালে থাকে।

কলেজ থেকে ফিরে চা জলখাবার খেয়ে রূপলেখা একদিন অভির খোঁজ নিতে গিয়ে দেখতে পেল, শোবার ঘরের এক কোণে বসে অভি ওর রোবটটা নিয়ে আপন মনে খেলছে। ‘অভি’ বলে ডাকতে রূপলেখার দিকে মাথাটা ঘোরালেও রূপলেখা লক্ষ্য করল ছেলে তার চোখের দিকে তাকাচ্ছে না। ছেলেকে প্রশ্ন করল, কী করছ সোনা?

রূপলেখাকে অবাক করে দিয়ে অভি ওর চোখের দিকে না তাকিয়েই উত্তর দিল, কী করছ সোনা। লীনা ঐ ঘরেই বসে ছিল। সপ্রশ্ন নয়নে তার দিকে তাকাতাই লীনা বলল, ম্যাডাম, একটা কথা অনেকদিন ধরে আপনাকে বলব বলব ভাবছিলাম।

- হ্যাঁ, বল লীনা, কী বলতে চাও?

লীনা একটু ইতস্ততঃ করে বলে, আপনারা দু’জনেই তো বেশ ব্যস্ত থাকেন, লক্ষ্য হয়ত করেন নি। কিন্তু, আমার সন্দেহ, অভির স্বভাবে ও চালচলনে কিছু অস্বাভাবিকতা আছে। হয়তো এটা খুব একটা উদ্বেগের নয়। তবু কোনও ডক্টরকে বা বিশেষজ্ঞকে একবার দেখিয়ে নেওয়া ভাল।

রূপলেখার দৃঢ় ধারণা, এমন হবার কথা নয়! ওর স্পষ্ট মনে আছে, সরকার থেকে যে সব কাগজ পত্র দেওয়া হয়েছে, তাতে স্পষ্ট করে উল্লেখ করা আছে যে এই জন্মজাত শিশুর জন্মগত কোনো রোগ থাকবে না। রূপলেখার উদ্বেগ হয়, তাহলে লীনা ঠিক কী বলতে চাইছে? ওর মনে এরকম

একটা সংশয়ের উদ্বেগ হল কেন? অভির কী হতে পারে?

- ঠিক আছে লীনা, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। ওর বাবার সঙ্গে কথা বলে দেখি, ওনার মতামতটাও জেনে নিই।

সব শুনে নীলাকাশও বেশ স্তম্ভিত। সংশয় নিরসনের জন্য পারিবারিক চিকিৎসক ডক্টর কৌশিক ভদ্রের কাছে একদিন অভিলাষকে নিয়ে যাওয়া হল। প্রাথমিক অনুসন্ধানের পর উনি মতামত জানালেন, অভিলাষের কিছু কিছু চালচলন ও আচরণ অটিজম স্পেকট্রামের মধ্যে পড়তেও পারে। কোনও অটিজম বিশেষজ্ঞকে একবার দেখিয়ে নিলে এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যেতে পারে।

রূপলেখার ঘুম আসতে চায় না। মাথার মধ্যে নানা উদ্বেগ ও চিন্তা ঘুরতে থাকে। ওরা তো মেয়ে তাতাথেকে নিয়ে বেশ সুখেই ছিল। মেয়ের বয়স তিন বছর হতেই দ্বিতীয় কোনও সন্তান নেওয়া হবে কিনা এই দ্বন্দ্বের মধ্যে নীলাকাশ আর রূপলেখা যখন দৌল্যমান তখনই ওরা জীবনের একটা নূতন মোড়ে এসে দাঁড়াল।

২০৪৯ সালের জানুয়ারিতে নূতন সরকার ভারতের দায়িত্বভার গ্রহণ করে বিভিন্ন নূতন নীতি ঘোষণা করতে শুরু করলেন। নূতন আইনও প্রণয়ন করা শুরু হল। তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের উদ্দেশ্যে নেওয়া যুগান্তকারি একটি পদক্ষেপ।

জনবিস্ফোরণ যে জাতির পক্ষে কতটা অভিশাপ তা সকলে উপলব্ধি করতে না পারায় যে হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিল তা বেশ উদ্বেগজনক। স্বাধীনোত্তর যুগের এক শতক অতিক্রান্ত হবার পর এখন দেখা যাচ্ছে যে ভারতবাসীর প্রায় সকলেই জন্মনিয়ন্ত্রণের গুরুত্বটা উপলব্ধি করতে পেরেছে।

২০৪১ সালে শেষবারের মতো যে আদমসুমারি হয়েছে তার সমস্ত তথ্যাদি এখন জাতীয় তথ্য ভাণ্ডারে লিপিবদ্ধ করা আছে। এখন থেকে প্রতি দশ বছরের পরিবর্তে ত্রিশ বছর অন্তর আদমসুমারি করলেই হবে। জন্ম ও মৃত্যুর কারণে জনসংখ্যার যে তারতম্য হয় তা জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধীকরণের সাথে সাথে ব্যাক্ষ অ্যাকাউন্টের মতো আপটুডেট হয়ে যাবে। প্রতিটি নাগরিকের বর্তমান শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মান, উপার্জন ক্ষমতা প্রভৃতি পরিসংখ্যানও এই তথ্য ভাণ্ডারে লিপিবদ্ধ করে রাখা হয় এবং এই তথ্যগুলো সর্বদা আপটুডেট করে

রাখার বন্দোবস্ত আছে। এই সকল তথ্য বিশ্লেষণ করে ভারত সরকারের বিভিন্ন দপ্তর সহজেই বুঝতে পারে কী কী ব্যবস্থা নিলে দেশের উন্নতি ত্বরান্বিত হবে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার এমন অগ্রগতি হয়েছে যে ‘ইচ্ছাসন্তান’ এখন আর কল্পবিজ্ঞানের বিষয় নয়। পরিকল্পিত জ্ঞাণ বা ডিজাইনার জ্ঞাণ এখন জাতীয় কয়েকটি গবেষণাগারে উৎপন্ন হচ্ছে। এটি সম্ভব হয়েছে ডি-এন-এর অন্তর্ভুক্ত জেনেটিক কোডের গঠনকৌশল জানতে পারা এবং তা নিয়ন্ত্রণ করার পদ্ধতি আবিষ্কার করার পর।

জ্ঞাণ কী ভাবে একটি মানব শিশুতে পরিপূর্ণতা লাভ করে তা নির্ধারিত হয় এই জেনেটিক কোড দ্বারা। বর্তমান ভারত সরকারের চিন্তাধারা এখন এইরকম - ডিজাইনার জ্ঞাণের সাহায্য নিয়ে কিছু ভাল ভাল নাগরিক সৃষ্টি করতে পারলে অদূর ভবিষ্যতে ভারতবর্ষের সর্বাঙ্গীন উন্নতি হতে বাধ্য। এই জন্যই এই যুগান্তকারি পদক্ষেপ।

তবে ডিজাইনার জ্ঞাণ উৎপাদনের কারিগরি কৌশল ভারতবর্ষে এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে আছে বলে কোনও কোনও সমাজবিজ্ঞানী সরকারের এই পদক্ষেপের ঘোরতর বিরোধী। তাঁদের একটি যুক্তি এই যে জ্ঞাণ সৃষ্টির প্রয়োজনীয় জেনেটিক কোডের গঠনকৌশল সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত না করে ডিজাইনার জ্ঞাণের সাহায্যে ভারতীয় সূনাগরিকের জন্ম দেওয়ার মত দুরূহ কাজে ব্রতী না হওয়াই শ্রেয়। দ্বিতীয় যুক্তি হল, সব কিছু সুনির্দিষ্ট থাকলে বৈচিত্র্যের অভাবে সমাজ হয়ে উঠবে অত্যন্ত যান্ত্রিক এবং এ ধরনের বৈচিত্র্যহীন যান্ত্রিক সমাজ মোটেই কাম্য নয়।

যাই হোক, নূতন সরকারের নূতন কিছু অবদান থাকবে এটাই তো স্বাভাবিক। সরকার ঘোষণা করলেন, জনসাধারণের জন্য সীমিত সংখ্যক পরিকল্পিত জ্ঞাণ বিতরণ করা হবে। একটি মাত্র সন্তান আছে এমন উচ্চশিক্ষিত (এবং জাতীয় মেধা তালিকায় যাদের নাম আছে এমন) পিতামাতারাই এই জ্ঞাণের জন্য আবেদন করতে পারেন। আবেদন কালে তাঁরা তাঁদের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী সন্তানের ঈঙ্গিত লিঙ্গ, চেহারা, চোখ, নাক, গায়ের ও চুলের রং, প্রাপ্ত-বয়স্ক অবস্থায় উচ্চতা ও ওজন কী প্রকার হবে তা মনোনীত করতে পারেন। কোনও বিশেষ বুদ্ধ্যাক্ষ উল্লেখ করা গেলেও শিশুটির সে বুদ্ধ্যাক্ষ যে হবেই এমন কোনও প্রতিশ্রুতি এই মুহূর্তে দেওয়া সম্ভব না

হলেও তার কাছাকাছি হবে এটুকু বলা যায়। সরকার থেকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হবে যে, নব জাতকের কোনও প্রকার জন্ম গত রোগ থাকবে না। তাছাড়া এই শিশুদের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা তুলনামূলক ভাবে বেশ বেশি থাকবে।

নীলাকাশ আই-এ-এস অফিসার, সরকারি ঘোষণার পূর্বেই এ সম্বন্ধে জানতে পেরে যায়। রূপলেখা পোস্টডক্টরেট এবং ওদের দুজনের নামই জাতীয় মেধা তালিকায় আছে। তাই এই ভ্রূণ ওরা পেতেই পারে। রূপলেখা অবশ্য বেশ রক্ষণশীল। নীলাকাশ ওকে প্রস্তাবটা জানাতেই বলল, তুমি কি পাগল হলে? তোমার নিজের বা আমার উপর কি তোমার বিশ্বাস নেই? শেষ পর্যন্ত হয়ত দেখলে ঐ ভ্রূণজাত সন্তান দেখতে হল নরসিংহের মত! তখন কি তুমি খুশি হবে? নীলাকাশ কিন্তু দমে যায় না। অনেক যুক্তি দেখিয়ে ও প্ররোচনা দিয়ে অবশেষে রূপলেখাকে রাজি করাতে সক্ষম হল। পুত্র সন্তানের তীব্র যে আকাঙ্ক্ষা রূপলেখার মনের গভীরে ছিল সেটাও বোধহয় এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে অনুঘটকের কাজ করেছে।

আজকের এই পরিস্থিতিতে, ওরা দু'জনেই এখন বেশ অনুতপ্ত। এই রকম একটা দুঃসাহস না দেখালেই হয়ত ভাল হত। ইতিমধ্যে কল্যাণীর এইমসের মনস্তত্ত্ব বিভাগের এক বিশেষজ্ঞের কাছে অভিলাষকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষার পর ওনারা নিশ্চিত হলেন যে অভিলাষ অটিজম এর স্বীকার। এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। নীলাকাশের এক আই-এ-এস বন্ধু পরামর্শ দিল, ক্রেতা-সুরক্ষা বিভাগের কারও সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করতে। নীলাকাশের আর এক বন্ধু ইন্দ্রাযুধ বাচোয়াত ঐ বিভাগের সচিব। তার সঙ্গে আলোচনা করতেই নিশ্চিত হওয়া গেল যে ভারত সরকারের মানব-সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ে অভিযোগ জানানো যেতেই পারে।

নীলাকাশের আর এক বন্ধু বিমলেন্দু চক্রবর্তী অভিযোগটা ঠিক মত সাজিয়ে লিখলেন। মানব-সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ে অভিযোগ জানানো হল। ভারত সরকারের মানব-সম্পদ উন্নয়ন বিভাগ ওদের দাবি মেনে নিয়ে ভাল পরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ দিতে রাজী হয়ে গেল। অভিলাষের ভবিষ্যতের কথা ভেবে সরকারের পক্ষ থেকে দুটো প্রস্তাব রাখা হল। এক, গবেষণার উদ্দেশ্যে অভিলাষকে একটা গবেষণাগারে পাঠিয়ে দেওয়া হবে এবং নীলাকাশদের কোনও দাবি ওর

উপর থাকবে না। তবে নীলাকাশরা চাইলে বিনিময়ে আর একটি পরিকল্পিত ভ্রূণ পেতে পারে।

দ্বিতীয় প্রস্তাব, অভিলাষের চিকিৎসা ও শিক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্ব সরকারের। অভিলাষের স্বভাব ও আচরণগত যে সামান্য ত্রুটি লক্ষ্য করা গেছে, আশা করা যায় যে চিকিৎসায় সে সব সংশোধিত হবে। তবে ভবিষ্যতে যদি এমন হয় যে অভিলাষ স্বনির্ভর হতে পারল না তাহলে নীলাকাশদের অবর্তমানে ওর ভরণ-পোষণের সব দায়িত্ব ভারত সরকারের। যদিও প্রথা অনুযায়ী 'দুটির বেশি সন্তান সরকার অনুমোদন করে না, দ্বিতীয় প্রস্তাবের ক্ষেত্রে নীলাকাশরা ইচ্ছা করলে নিজস্ব ভ্রূণের আর একটি সন্তানের জন্ম দিতে পারে।

যে কোনও একটি প্রস্তাবে ওদের রাজী হতে বলায়, নীলাকাশ ও রূপলেখা সরকারের প্রস্তাবগুলো নিয়ে অনেক আলোচনা ও চিন্তা ভাবনা করল। এখন অভিলাষের বয়স তিন। এতদিনে অভিলাষের উপর অনেক মায়া পড়ে গেছে রূপলেখার। ওদের স্বভ্রূণজাত কোনও সন্তান তো অভিলাষের মত হতেই পারত। তাহলে কি ওকে সরকারের হাতে তুলে দিতে পারতো ওরা?

রূপলেখা তাই মনস্তির করল, সরকারের দ্বিতীয় প্রস্তাবটাই ওরা গ্রহণ করবে। অভিলাষের মত নিষ্পাপ ও অসহায় একটি শিশুকে ছেড়ে ওরা কেউই সুখে থাকতে পারবে না। ওদের যত্ন ও ভালবাসা পেয়ে নিশ্চয়ই ও একদিন সম্পূর্ণভাবে সুস্থ ও স্বাভাবিক হয়ে উঠবে। তৃতীয় কোনও সন্তানের ওদের প্রয়োজন নেই এবং সে রকম কাউকে পৃথিবীর আলো দেখাতে ওদের দু'জনেরই বেশ আপত্তি।



Life is Hard, So You Better Not Cry!

Mahika (Shree) Banerjee, Grade 4

I had to go to school again. My mom and I had a discussion. Here's how it went:

Mom: *Cooking* "So, DCT you're going back to school tomorrow."

Me: *Spits out all 99 Persimmons that were in my mouth. That's got to be a record.*

"What?! But I went yesterday!"

Mom: *Still cooking and not turning around. That's not the kind of respect I deserve. You're always supposed to look someone in the eye when you speak.*
"Yup. I agree, it's going to be fun!"

Me: *Gags just a little when I remember about my nasty schoolmate Naster. He swallowed a blackberry and puked all of the food he had from the last month. After that he yelled cheerfully "More snack for me!" and started eating his barf.* "Mom that's not what I said. And Naster –"

I really didn't have a choice but to stay quiet, did I? Unless I wanted to get bit by my mom. Biting is how deer spank each other.

You see, the reason I freaked out was if you're a deer in my school, you're only supposed to come to school once a week. All the other days have different activities. You can get embarrassing moments if your teacher sees you at school twice in a row, like crawling under everyone's desk while the deer step on you.

Oh, DCT stands for Dream Come True, but that's my nickname. My real name is Blackdeath because my mom said the day I was born a wolf saw me and I killed him. By accident! I didn't mean to!! Why did that stupid wolf look at me anyway? 'Cause I was big and round back then? He literally killed himself!

The black part is called black because my fur's black.

Well when I was a baby my tail was only black but then my fur became black. I'll explain later. I promise.

Wish me luck! About the school thing ...

* * *

I went to the principal's office yesterday. It really wasn't my fault!!

I went for a walk at 8:00 P.M. I didn't know where I was going, but that's ok because I knew this place by heart. I finally wandered to the mud pond last night. And I slid!!!!

As I struggled out and reached the top, I fell back in, and that's when my evil plan was coming up. I rolled around in the mud some more. I twirled, whirled and pirouetted, until I was completely covered in mud.

I went to the wise bee (and got a very warm welcome. I got stung. Right in the middle of the nose. So I have a red nose with a black border.) I asked him for green irises, since I have brown irises.

He told me to find a Venus Fly Trap and 2 dead bugs. He also told me to drop one dead bug in the Venus Fly Trap and lower my head so my eye was in there. When it snapped, my eye would get snapped too. I was supposed to do it with both eyes. So I did. I went back to the wise bee's hut. He gave me a mirror and my irises were light green with dark green lines around the pupil.

The only problem was that when I came home I wasn't allowed because when I was coming in, it was 1:00 A.M. and everyone in my family was sleeping. I didn't make a sound but my baby brother started crying. So my mom came down and turned on the light. I didn't know that she came down, so I screamed.

You know when its pitch black and the light suddenly turns on and you scream? Well, that's what happened.

Anyway, back to the story. Since I screamed, it made my mom scream and that made me scream. I knew by now my older sister and brother, little sister and baby brother, and my dad would be awake.

Finally we both got the courage to turn around. When we did, my mom screamed again but I yelled "Mom!" But I don't think mom noticed me because she screamed my dad's name and my older brother's name and they both picked me up with their antlers and threw me outside the house.

I finally slept in the garden. There was itchy grass that poke my black, glossy fur - I mean brown, crusty fur. Oh, you want to hear something cool? It's a secret I never told anyone. Cloven hoof promise me that you won't tell anyone.

Wait, that doesn't make sense 'cause right now I'm a character in a book and you can't touch characters in books. I'm confused. Can the characters come out of a book?

Anyway, back to the topic. Oh! And something else! I always keep my promises. Remember when I wrote "Well when I was a baby my tail was only black but then my fur became black. I'll explain later. I promise."?

If not, go reread it. We'll postpone the rest of the story until you're done.

So you done yet?

Now for real, back to the topic. I haven't even told this secret to my family. When I was born, I only had a black tail. But when I was a year old I started to lose my baby brown fur and started to get black fur. I freaked out and thought I got a rash. My younger sister and brother weren't born then. My parents were on a business trip and older sister and brother had to go with them. This is why I had to stay for a year with a babysitter because the business trip was for a year and I didn't match the height to go on the trip.

I stayed for 2 weeks and ran off. I didn't like my babysitter. First of all, she didn't do her job. She didn't sit on me! What's the point of being a babysitter then? Second, all she did was bring friends over and watch

TV. No wonder she had glasses. Third, when her friends were at home she used to bite me and then laugh. All of her pesky little friends used to laugh. I only liked one of them. She always protected me.

I said I ran off right? You want to know where I lived for a year. For all who do want to know, I lived in a tree. This nice woodpecker took me in. She had her own bald things too. The bald things looked disgusting. They had some puffs of fur on them too. Well they had these hairy things on them.

I pretended that I was a baby (which I was) and couldn't walk so well. I purposely fell and tripped.

She said she loved carving so she made a room above her room. The new room she made became my room. On the floor of my room there was a hole. The hole was for Mama Woodpecker. She used to poke her head and ask me how I was doing. If it wasn't that she would bring some berries for me.

There was a secret compartment for me. My room had a branch attached to it. I know that trees are completely full with bark but I said Mama Woodpecker loved carving so she carved the inside out. That branch led to the front door. The front door was a cut out circle. The circle was attached to moss. So from the outside it looked like it was closed but from the inside it wasn't. Well, it was my front door. I know it would hurt if I fell from a branch, so there was a 1 foot high patch of moss. And let me tell you, moss is really soft. When I knew my parents were coming back, at the middle of the night I snuck out and went home. It was that simple.

Lucky for me every day my babysitter used to sleep in the house. So the day my parents came back I was downstairs. When my babysitter saw us hugging, she was so confused.

* * *

I went to school on my own. The minute I arrived, the principal was at the door. He saw me and said, "Aaah! You must be the new student. Follow me now."

The funny thing was 2 minutes later the real new student came. I have been staring at her for a long time. I



could tell she was the new student. I told the principal that I needed to go to the bathroom. Instead I went to the new girl and asked, "What's your name?!" She said it was Eemeelee.

When I came back from the bathroom, the chief asked me my name. I said Eemeelee. He told me to spell it. I didn't know how to spell it but I guessed and it was right!

Then he asked me if I could swim. I could swim. When I asked why, he said, because we were planning to get a swimming pool. I said, no, I couldn't swim well even though I could. Actually I have more than 50 prizes of 1st place national swimming. I should've said yes because he told me to try to swim.

After he saw me swim he told me how great I swim. He blabbered how I should be on the national swim team. It went like this:

"I can't believe how well you swim. You should go to the nationals. They give prizes you know. And blabber blabber blabber blabber blabber blabber ..." I loved his beautiful blabbers – I, uh, mean, um, speech.

Then he looked at me real funny. I asked real nervously “What?” and he asked me very solemnly “Do you have color – changing fur and irises?”

That's when he gave me a mirror. I actually wanted to say, "Mirror, mirror on the frame, who is the real new student that actually came?" because I was normal.

The principal went to the phone, called someone and looked at me and said, "You are in big trouble, young lady."

What I wanted to say was, “Young lady! PSHHHH! You call my parents but you don’t even know my name!!! What kind of principal are you?!! HMM-MMM?!!!!!!!!!!!!”

It's a good thing I didn't because right then the dum-mypal – I, uh, mean principal said "Your parents are in the parking lot, Blackdeath. You're getting detention for a month. Your job during detention is to clean up all the trash."

Dummypals must be mind readers because I think cleaning up trash is a bit too much.

On the way home my mom blabbed everything on her mind. I wasn't listening but when I did this is what I heard:

“Blabb blabb blabb blabb blabb blabb blabb blabb
blabb blabb blabb you have to understand to use your
manners blabb blabb blabb blabb blabb blabb blabb...”

[illegible]

So I did.

My mom freaked out. Mostly about the family thing. This is my family and their names.

Oldest

Dad = Killer

Mom = Risky

Oldest Brother = Doger

Older Sister = Swiftly

Me = Blackdeath

My Youngest Sister = Lilacs

Baby Brother = Wiggles

Youngest

Here is the love thing:

Most loved

1. Me
2. Mom, Lilacs, Wiggles, Doger, Swiftly, Dad

LEAST loved

After I gave that wonderful speech my mom, dad, Doger, Swiftly, Lilacs and even Wiggles wiggled over and we did a massive group hug together.

I was so happy!

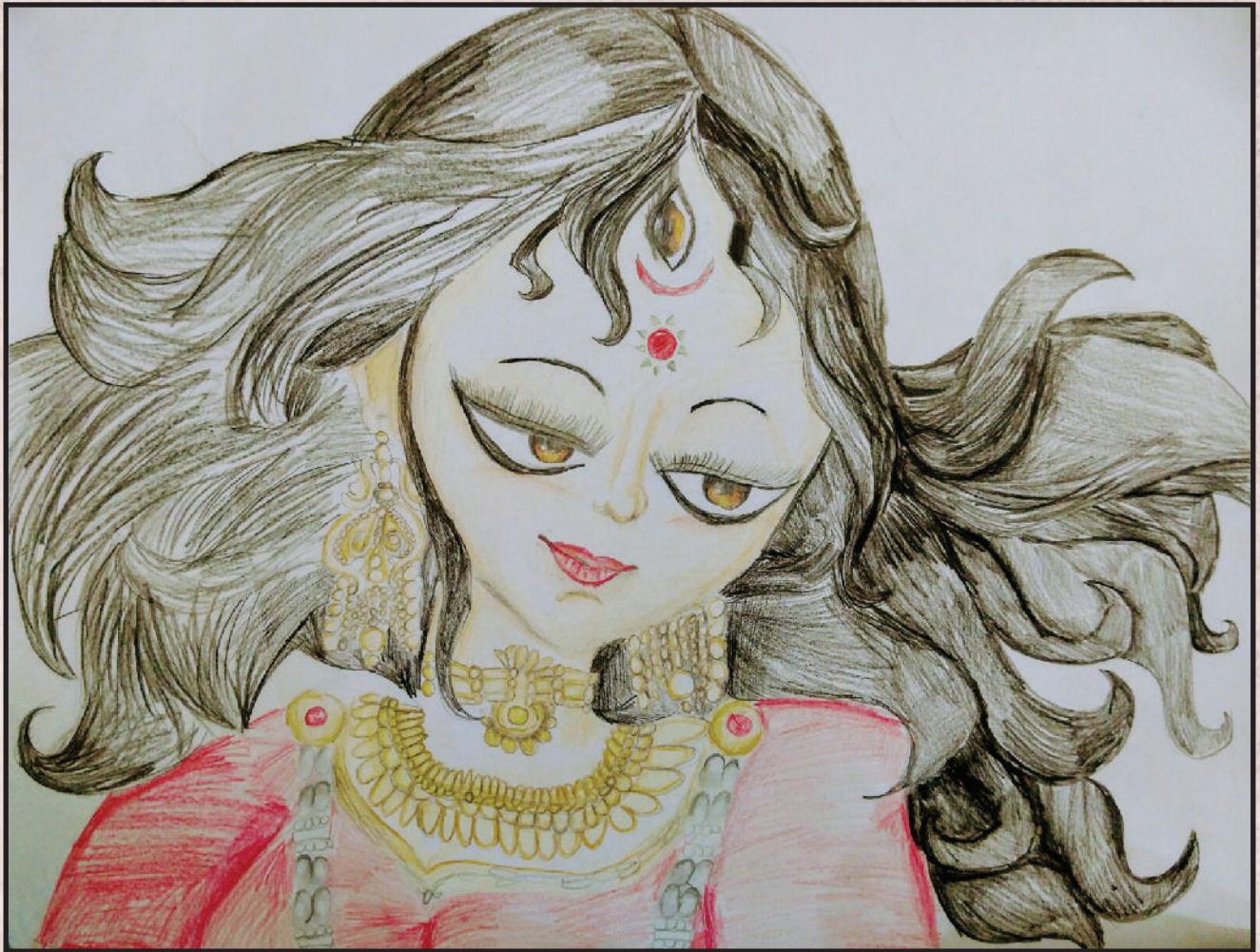
I 'was' so happy. I was happy, until my mom announced this:

WE ARE GOING TO HAVE A FAMILY DAY?! LIKE WE SPEND THE WHOLE DAY WITH OUR FAMILY?

WHAT?! Whoa, whoa, whoa ... pause it right there. Give me the remote Lilacs so I can press the 'pause' button. Eh, I'll get it myself. Ok. Now where was I?

Oh yeah! You can see how scared I am for these days?

MOST DEFINETLY YES!!!!!!



Artwork by: **Divija Nath** (4th Grade)



Artwork by: *Sarbari Ghosh*

বিদায়বেলা (সুচিত্রাদি স্মরণে)

শঙ্কর সেনগুপ্ত

জাকুরিয়া ব্রীজ থেকে রিক্সা
নিয়েছি। সাল ২০০২।
সঠিক দিন তারিখ মনে নেই।
হেমন্ত গড়িয়ে শীতের প্রস্তুতি
কলকাতায়। তবে কাল সারারাত
আর আজ সকালের বেশ
কিছুক্ষণ বৃষ্টি পড়েছে। বেশির
ভাগটাই ঝিরঝিরে, তবে
ভোররাতে ঘুমের আবেশে
শুনেছি জানালার কাঁচে তেজী
বৃষ্টির ঝাপট। দশটা নাগাদ
গন্ধগ্রীণে যখন মিনিবাসে
উঠেছি তখন আকাশ মেঘলা
- তবে বৃষ্টির ছিটেফোঁটা নেই।
গন্তব্য ৩১/১ শরৎ ঘোষ গার্ডেন
রোড - লেখিকা সুচিত্রা ভট্টাচার্যের বাড়ী।

আমাদের পাশের ফ্ল্যাটের রুমা-বৌদি সুচিত্রাদির বিরাট
ফ্যান। আমি দেখা করতে যাচ্ছি শুনে খুব উৎসাহ। কখনো
বলছেন, “আমাকে নিয়ে চল”। আবার বলছেন, “তোরা থাকিস
বিদেশে আর তোদের সঙ্গে কিরকম আলাপ হয়ে গেল? আর
আমি সেই কবে থেকে ওনার বই -” ইত্যাদি। মনে করিয়ে
দিই - আলাপ এখনও হয়নি। সেই গ্রীষ্মে সুচিত্রাদি মাননীয়
অতিথি হয়ে এসেছিলেন আমার শহর অ্যাটল্যান্টায় ২৩-তম
‘উত্তর অ্যামেরিকা বঙ্গ সম্মেলন’ উপলক্ষে। আমার বউয়ের
নামও রুমা - অ্যাটল্যান্টার শহরতলিতে আমাদের তখন
বাড়ন্ত সংসার। মে মাসে আমাদের দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম -
তার দুই মাস পরেই বঙ্গ সম্মেলন। তাই গিয়ে উঠতে পারিনি
আমরা। আলাপের সুযোগ কোথায়? প্রতি পূজায় আমাদের
শারদীয়া ম্যাগাজিন বেরোয় - ‘প্রতীচী’। আমাদের দুই এডিটার
সৌমিত্র ও রক্তিম এডিটোরিয়াল বোর্ডের কাছে প্রস্তাব রাখেন
সুচিত্রাদির লেখা ছাপাবেন সেই বছরের শারদীয়া সংখ্যায়।
আমার এখনও মনে আছে সেই এডিটোরিয়াল বোর্ডের
মিটিংয়ে কত পয়েন্ট এবং তারও অনেক বেশি কাউন্টার

পয়েন্ট। কেন লোকাল লেখক
লেখিকারা তো ভালই লিখছে
- আবার পয়সা দিয়ে বাইরের
অথারের দরকার কী? এখানের
লোকে ওঁর কদরই বুঝবে
না। কত আলোচনা। শেষমেষ
২০০২ সালের ‘প্রতীচী’তে
বেরল সুচিত্রাদির ছোটগল্প
- ‘গৃহপ্রবেশ’। বৃদ্ধাশ্রমে
অমলের মা স্মৃতিকণার
আশা-নিরাশার গল্প। ছেলের
ফ্ল্যাটে নিরস্তিত্ব জায়গা খুঁজে
নেওয়ার গল্প।

অবশ্য এর আগে গতকাল রাতে করেছি
সুচিত্রাদিকে ফোন। সৌমিত্রই আমার আসার
আগাম খবর দিয়েছিল সুচিত্রাদিকে। শঙ্কর আসবে
আপনার কাছে ম্যাগাজিনের কপি নিয়ে। তিনি ফোন তুলতেই
আমতা আমতা করে বলেছি, “আমি শঙ্কর। আমি আসছি
অ্যাটল্যান্টা ...” একটু বকেই দিলেন মনে হল। “আমি জানি
তুমি এসেছ প্রায় দুই সপ্তাহ কেটে গেছে। আমিই এবার
তোমাকে কল করতে যাচ্ছিলাম! কাল সৌমিত্রের থেকে তোমার
নম্বর নিয়েছি।” একটু থতমত খেয়ে ফোন নামিয়ে রাখি। তার
আগেই বলে দিয়েছেন চটজলদি ওনার শরৎ ঘোষ গার্ডেন
রোডের ঠিকানা। সেই রামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠের উল্টোদিকের
তিনতলার বাসা। “সকাল সকাল চলে এসো, সময় নিয়ে গল্প
করা যাবে।”

সত্যিই তো দু-সপ্তাহ কেটে গেছে কলকাতায় নেমেছি।
তবে এই দেৱীর যে একটা কারণ ছিল। প্লেন থেকে নেমেই
ছুটেছি বইয়ের দোকানে। কলকাতা ছেড়েছি প্রায় ষোল
বছর আগে। তার আগে যাদবপুরের ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের
সহপাঠীদের সংস্পর্শে এসে ভাক্‌লাভ হাভেল, হোর্হে আমাদো
পড়ে ফেলেছি, কিন্তু সমসাময়িক বাংলা সাহিত্য পুরোপুরি

উপেক্ষা করেছি। সেটা যে আমার বন্ধুদের দোষ তা নয়, আমারই উদাসীন-উপেক্ষা। সেবার ‘প্রতীচী’র জন্যে তাঁর রচনা সুচিত্রাদি পাঠান হাতের লেখা স্ক্যান করে। আমিই ভার নিই টাইপসেটিংর কাজের। এখনও মনে পড়ে নব্বই বছরের বৃদ্ধাশ্রম-বাসিন্দা হেমললিনীর খনখনে স্বর, “ছেলে নিতে এসেছে তো শোনানোর কী আছে? যন্ত সব আদিখ্যেতা।” সেই স্মৃতিকণার সহবাসিন্দা হেমদিদি - অনেকদিন যার কেউ খোঁজ নেয় না। নাতি-নাতবউ কেউ না। মনে কীরকম একটা দাগ কেটে গেল।

তাই সুচিত্রাদির সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার আগে একটু হোমওয়ার্ক করে নেওয়া ভাল মনে হয়েছিল। তাও আবার উপন্যাস পড়বার ধৈর্য বা অবকাশ কোথায়। তবে সেই দুই সপ্তাহ গোথসে গিলেছি ওনার ছোট গল্পের কালেকশন। পাশের ফ্ল্যাটের রুমা-বৌদি দিয়েছিলেন দুই একখানা বই। সেই সকালে যেন পরীক্ষা দিতে বেরিয়েছি, এমন একটা ভাব। সেলিব্রিটি বলে কথা। বেশ নার্ভাস লাগছিল। সত্যিই যদি এনগেজড হতে হয় গভীর বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় - তাহলে আমার এন্টিমেটে বেশিক্ষণ টিকব না। ভালই হবে। গড়িয়াহাটে একটু শপিং করে লাঞ্ছের আগেই বাড়ি ফিরে আসতে পারব।

মিনিবাস থেকে নেমে রাস্তা পার হয়ে উঠেছি রিক্সায়। ঢাকুরিয়া রেল লাইন পার হয়েই দেখি হাঁটুজল কুলু কুলু করে ভেসে চলছে রাস্তার একদিক থেকে অন্যদিকে। আমি তো রিক্সায় বসে, মুশকিল তো রিক্সাওয়ালায়। জল ঠেলে তো রিক্সা আর এগোয় না। ঐকেবঁকে চলেছে রিক্সা কখনও স্রোতের সঙ্গে, কখনও বা স্রোতের বিপরীতে। এর মধ্যে আবার নামল ঝাঁপিয়ে বৃষ্টি। মোটা ক্যানভাসের পর্দা ফেলে দিয়েছে রিক্সাওয়ালা, তাতে যেন আরো বেশি ভিজে গেলাম। আমার স্ত্রী রুমা মুন্সাইয়ের মেয়ে - বৃষ্টির সঙ্গে ওর চিরকালের যুদ্ধ। সময়ে মুড়ে দিয়েছে প্লাস্টিক ব্যাগে ‘প্রতীচী’র কপি। প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে রয়েছে প্লাস্টিকে মোড়া বইখানা - আমার ‘পাসপোর্ট টু এ সেলিব্রিটি এনকাউন্টার’!

সুচিত্রাদির বাড়ীর সামনে রিক্সা থেকে নেমে দেখি জিন্সের পা ভিজে সপসপে। পা-টা উল্টে জল নিংড়ে উঠেছি তিনতলায়। কোলাসবিল গেট - তার ওপারে খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে সুচিত্রাদি নিজে। চোখে চশমা, কপালে টিপ, এক মুখ হাসি। তাঁর সহজ সম্ভাষণে যেন কতকালের পরিচিতি। সেদিন কি করে যে কেটে গেল অতটা সময় সব বিস্তারিত মনে নেই।

তার মধ্যে প্রদীপদা (সুচিত্রাদির স্বামী) অফার করেছিলেন লুঙ্গি আমার ভিজে জিন্স যতক্ষণ না শোকায়। সুচিত্রাদি বকেই দিলেন, “বিদেশি গেস্টদের এরকম ভাবে অপ্রস্তুত না করলেই নয়? ও জিন্স এক্ষুণি শুকিয়ে যাবে। চল, চল, অ্যাটল্যান্টার গল্প করি। তা সবাই আছে কেমন?” অ্যাটল্যান্টা, বঙ্গ সম্মেলনের কিছু গল্প, কলকাতার বাড়ির গল্প, কেন ফ্যামিলি নিয়ে এলাম না, ইত্যাদি কত কথা। খালি মনে আছে সাবলীল কয়েকটা ঘন্টা গল্পগুজব করেই কেটে গেল। মাঝেই মাঝেই চা, মিষ্টি, খাবারদাবারের কনস্ট্যান্ট সাপ্লাই। গল্প চলার ফাঁকে ফাঁকে উনি বোধহয় অনেকটাই জেনে নিলেন আমাকে। খুঁচিয়ে প্রশ্ন করে নয়, সহজ প্রত্যয়ের অকপট আস্থাস্থাপন। সেই প্রথম পরিচয়ের বুঝে নেওয়া প্রতিটি পার্সোনাল ডিটেল গুলি সব মনে রেখেছিলেন আগামী বারো বছরের আমাদের বিরল পাঁচ কি ছটি আড্ডার আসরে। মনে পড়ে কী শিশুশুলভ উৎসাহে আমার হাত থেকে ‘প্রতীচী’র কপিটা নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখলেন। বললেন, “দেখ, দেখ, বিদেশি ম্যাগাজিনে আমার লেখা বেরিয়েছে!” ‘দহন’, ‘তিতির’, ‘ইন্দ্রাণী’র সৃষ্টিকর্তার অনাবিল আনন্দের হাসি। বিদেশি পূজাবার্ষিকির তিনপাতার গল্পের আনন্দের হাসি। সেদিন থেকে সুচিত্রা ভট্টাচার্য হয়ে গেলেন সুচিত্রাদি।

সেদিন সাহিত্য নিয়ে কোনো গভীর আলোচনাই হয়নি। তাই গড়িয়াহাটে শপিং নয়, পাক্সা সাড়ে তিন ঘন্টা কাটিয়ে এসেছিলাম ৩১/১ শরৎ ঘোষ গার্ডেন রোডের তিনতলায়। সেদিন বাড়ি ফিরে এসে চট করে বাড়ির কারুককেই সহজে ব্যাখ্যা করে উঠতে পারিনি যে কেন উনি অনায়াসে আমার সঙ্গে এতটা সময় কাটালেন। সৌমিত্র যখন আমাকে বলেছিল ওনাকে ম্যাগাজিনের কপি দিয়ে আসতে, আমার সংশয় কাটাতে বলেছিল বটে উনি একেবারে মাই-ডায়ার লোক।

এর পর অনেক বছর গড়িয়ে গেছে। ছেলেদের বয়স বেড়েছে। আমাদের দেশে যাওয়া খুবই ইনফ্রিকোয়েন্ট। মা-বাবা, শ্বশুর-শ্বশুড়ীই ঘুরে যাচ্ছেন অ্যাটল্যান্টায়। তবে যে কবারই গেছি - প্রতিবারই দেখা করেছি। এখন আর ‘প্রতীচী’র কপি হাতে নয়, কোনো অজুহাত ছাড়াই দেখা করতে যাওয়া। প্রতি পরিচয়ে - আমাদের বলব না, বলব আমারই সন্মোচ ধীরে ধীরে কেটেছে। জানিয়েছি আমার উপন্যাস পড়াতে অনাসক্তির কথা। তবু নিজের হাতে সই করে দিয়েছেন দুখানি উপন্যাসের কালেকসন। বলেছেন, “আমি কাউকে জানাই নি, আমি অ্যাটল্যান্টার অভিজ্ঞতা নিয়ে একটা উপন্যাস লিখেছিলাম। বেরিয়েছিল বাংলাদেশের পত্রিকায়। কিন্তু অ্যাটল্যান্টার আমার

সেই বান্ধবীকে নিয়ে লেখা সে ঠিক ভাবে নিল না। একটু পড়ে দেখো। জানিও কীরকম লাগে।” সেই গল্প পড়ে আমি জানাতে চেয়েছিলাম ওনাকে যে এই প্রথমবার আপনি আমাদের পুরুষ মানুষের পরিপ্রেক্ষিতটা বেশ সুযম ভাবে তুলে ধরেছেন। গল্পের কাঠামো ভাল লাগতেই পারে, কিন্তু যে বন্ধুকে নিয়ে লেখা, তিনি আমারও পরিচিত। আর কে জানে গল্পের কতটা সত্যি আর কতটা কল্পনা। তাই আমার প্রতিক্রিয়া অনুভূতই থেকে গেছে। এর বাইরে কত গল্প - মেলবোর্ণ থেকে সিডনি গাড়ি চালিয়ে যাওয়ার আনন্দ, টোরেন্টো তে প্লেনে ফাস্ট ক্লাসেও পা ফুলে যাওয়া, ওয়েস্ট বেঙ্গলের পলিটিকাল প্রবাহের উদ্ভেজনা আর হতাশা - কত হাসি, কত অভিমত। আর ছিল একটা মনের মত ফ্ল্যাটের অবিরাম অনুসন্ধান। বলতেন, “এই তোমাদের মত লোকদের আবার রেল ক্রসিং পেরিয়ে এখানে আসা।” ফ্ল্যাট না পাওয়ার ব্যর্থতা প্রথমে ছিল হাসি ঠাট্টার খোরাক - তবে পরে বুঝেছি সেই অভিজ্ঞতা সময়ের সাথে সাথে কিছুটা তিক্ত হয়ে উঠেছিল।

গত বছর গিয়ে উঠতে পারিনি। এবার মার্চ মাসে ব্যাঙ্গালোরে কাজ সেরে গেছি দিন তিনেকের জন্য কলকাতা। গেলাম এক শনিবার বিকেলে। এবার দরজায় এলেন না। প্রদীপদা ঘরে এনে বসালেন। সেদিনের জোর গল্প ফেসবুকে ট্যাগিং নিয়ে। ২০০৮ সালের শেষ দিকে আমি ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খোলার পর অনেক তাগাদা দেওয়ার পর সুচিত্রাদি ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খুললেন ২০১০ সালে ওনার জন্মদিনের দিন। সাথে সাথে আমন্ত্রণ চলে এলো। একটু অবাকই হলাম। কিছুদিন আগে অবধিও ছিল, “না না আমি ওসব পারি না। আবার ছবি তোলা, এই করো সেই করো” সাথে সাথে আমন্ত্রণ গ্রহণ করে দেখি বন্ধু সংখ্যা মাত্র দুই। এখন সেই সংখ্যা পাঁচ হাজার ছুঁইছুঁই। সেই পাঁচ হাজারের কতিপয় বন্ধু নিজেদের সব পার্সোনাল পোস্টিং-এ সুচিত্রাদিকে ট্যাগ করছে। বলে ওঠেন, “এই যে এ, যত নষ্টের গোড়া। বলেছিলাম না ফেসবুক-টেক্সট বড় হ্যাপা। আমি নিজের পোস্ট আর কোথায় করি, খালি অন্য লোকের অবাস্তুর ট্যাগিং এর খেসারত দিচ্ছি।” প্রদীপদা, কুণালদা (সুচিত্রাদির ভাই) আর আমরা আলোচনা করি - ঠিক হয় ফেসবুক এটিকেটে নতুন আইন: ট্যাগ করলেই ত্যাগ। তবে সেদিন আর বেশীক্ষণ বসিনি। দেখলাম যেন কোথায় একটু বিষন্নতার ছোঁয়া। এবার আমিই একটু বকে দিই, “মন শক্ত রাখতে হবে।” কথাটা বলে বড় খেলো মনে হল - কতদিন আসিনা, থাকি বিদেশে। উনি হেসে বললেন, “উঠবো, উঠবো, কাটিয়ে উঠবো। পরের বার দেখবো। আর এইসব ফেসবুক দিয়ে কাজ হবে না। আমাকে হোয়াটস-অ্যাপ এ টেক্সট

কোরো।” ওনার সেই স্বভাবসিদ্ধ মাথাটা ঝাঁকিয়ে চোখটা টিপে। যাকে সোশাল মিডিয়াতে বউনি করাতে গিয়ে হিমশিম, তাঁর এখন কত অপারেটিং চ্যানেল। বলি, “দাঁড়ান - আপনার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারছি না। ঐ অ্যাপটা একবার বসিয়েছিলাম বটে তবে নতুন ফোনে নেই।”

প্রদীপদা সবসময় আমাকে একতলার দরজা অবধি এগিয়ে দেন। বার দুয়েক গাড়ি করে নামিয়েও দিয়েছেন আমাকে যাদবপুরের মোড়ে। আজ গাড়ি নিয়ে এসেছি। গাড়ির দরজায় আমার মুখের দিকে তাকিয়ে অব্যক্ত প্রশ্নের উত্তরে বললেন, “শী হ্যাজ ইমপ্রুভড আ লট। আমরা সাপোর্ট দিয়ে চলেছি। শী নেভার রিয়েলি রিকভরাড ফ্রম দ্যাট ফল। প্রতিদিন একটু একটু করে ক্রমাগত ইমপ্রুভমেন্ট। আপনারা আসবেন। ওনার একটু ডাইভারশন হয়। আমাদেরও ভাল লাগে।” গাড়ি এগিয়ে চলে, প্রদীপদা হাত নাড়েন। আমি আর একবার দেখে নিই সেই তিনতলার জানালাটার দিকে। মনে মনে বলি, “আই নো ইউ উইল মেক ইট থ্রু।”

এপ্রিল ৬, স্যানফ্রান্সিসকো এয়ারপোর্টে অ্যাটল্যান্টার ফ্লাইটের জন্য অপেক্ষা করছি। রেড আই - মানে সারারাত প্লেন উড়বে আর নামবে ভোর বেলায়। ঘুমহীন লাল চোখ নিয়ে যখন নামব তখন ভোর ছটা। বাড়ি এক জায়গায় - কাজ দেশের অন্য প্রান্তে। তায় ফ্লাইট আবার তিন ঘন্টা লেট। হোয়াটস-অ্যাপে সুচিত্রাদিকে টেক্সট করি। হোয়াটস-অ্যাপে ওনাকে প্রথম টেক্সট। দুমিনিটে উত্তর আসে। উনি সমবেদনা জানান আমার এই উইকলি যাতায়াতে - “সত্যি বেশ বোরিং।” আমি বলি, “এবার প্লেনে তুলছে। চলি।”

উত্তর আসে, “ক্যারি অন।”

স্মৃতিচারণা: ২০১৫ সাল, সুচিত্রা ভট্টাচার্যর মৃত্যুর ঠিক পর পরই।



THE INDEPENDENT DRIFT - স্বাধীন বাতাস

As I pan thru the eyes of Sumana Goswami (didibhai) on her recent Speech Translation experience of the Indian Prime Minister.

LittleWriter-Ayan Chax

17th August 2017, Calcutta

PROLOGUE

14th August 2017-Day

With the sandwich gently gripped across fingers and the semi-burnt breadcrumb placed on horizon just near my mouth to have a bite of it, I paused for a couple of minutes to check on my phone that was flooded with several unread app notifications since the last one hour then.

As I swept across most of the lesser important notifications just from the preview-pane of my iPhone, I could see a WhatsApp text notification containing the subject that read “CNN Center, Downtown Atlanta”. It was almost 8:30 AM then, where the notification came along from one of my senior-level colleagues at work, Mr. Ismail Charania, a legit energized enterpriser in his early 70s, who is renowned for his global paintbrush when it comes to Multiple Language Interpretation and Translation, given that, since the last few months, I have been in professional terms with him as our realms of work culture are identical. Being a Professional Language Interpreter for almost five years now, I had had this opportunity to work and manage interpreting sessions with Mr. Charania himself, on a few occasions thus.

However, this time with his text coming along

with a CNN thing in it, I was not exactly sure with the abstract and thumbnailed preview of the notification. I scrolled down anxiously to open the WhatsApp Message and to my surprise, I could find that Mr. Charania has offered me an opportunity to English-Translate the 70th Indian Independence Day Speech(Hindi) by the Hon’ble Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, and that too LIVE directly from the CNN News Broadcast Center, Atlanta.

Minutes later, after his message came along, Mr. Charania, himself called me up over the phone and explained me more on this. Over the call, he described me the entire thing as to how exactly it is going to be, where he forwarded me an email containing the official request that CNN sent him for this event. Mr. Charania, who had previously done a few **NaMo** sessions was initially supposed to represent this assignment. But unfortunately, he called himself off as he had some medical issues back home and thus he nominated me to take the honor by replacing him on this great CNN platform. We talked for quite some time over this and finally I agreed over his proposal of the event and hung up the call.

And just after that, a lady named Monica from the business linguistics agency called me up to



Artwork by: *Susmita Dhar*, 4th grade

hire and confirm my availability for the event as directed by Mr. Charania. On hanging up Monica's phone call with a positive gesture and resting myself back on that extra-cushioned portico-sofa, as I finished that last sandwich crumb. I nodded to myself in happiness whilst my eyes were Velcro-glued to my phone screen understanding every minute details of the WhatsApp text that Mr. Charania sent me minutes ago, given that, by then, the ***What, When, Where and How*** quo-birds started tweeting around my head. Asymptotically, just few seconds to that, out of my Hindu inherited fallacy, I also verified the message in the forwarded email from Mr. Charania to ensure if it was the same as WhatsApp. And Oh Yes!! it was the exact same message!! Purely Indian at heart you see!! With this said, I believe you can now visualize my scene up-to, here, right?

But as rhetorical it may sound now, I was excited, nervous and speculative at the same time as I had only few hours left to join in for the Independence Day Translation Assignment at the CNN Center which was scheduled at 10 PM EST the same day, or more precisely 15th August 7:30 AM IST.

That moment for me was happiness. It felt like a milestone of success just kissed me inside a room

CNN Center Down-Town ATLANTA 14th August 2017-Evening **MONOLOGUE**

The breeze in a 23 degree Celsius Atlanta evening has always been my romantic favorite since I am here, such that if you are new here in States or in for the first time, it would make you feel romance the same way you get to see in those English Romantic Movies initially in your childhood days. With light moist breeze pulping in as the

that was pin-drop silent, and that is when, I again realized on the social network quote viral these days, which truly says '***Success always kisses you in silence and Failures in Public***'.

I believe, being an NRI for 15 odd years now, this overrated feeling of happiness on yourself is more like some reactive stimuli that acts from within and makes you emotional and patriotic at tandem, when you are assigned to do something for your very own motherland, India, and that too sitting thousand miles away from home. On a lighter note, being a Bollywood buff for years now, having got the news, I somewhere related myself to the character of Mohan Bhargav played by Shahrukh Khan in Madhur Bhandarkar's cult classic Swades, such that tunes of the song "Yeh Jo Des Hain Tera ..." scored my thoughts in the background as I gradually devoured that sandwich and all those emotions within.

Later that evening! My Mother, who's with me here, since the last one month, blessed me and smartly said "... chinta keno korchish.. ja korish tai korbi", meaning, you need not have to think too much, you will do what you always do.

evening started to set in slowly, I switched off my headphones and parked the car in the parking deck allotted for employees and visitors across the street from the center on the Centennial Olympic Park Drive.

Erm, finally!! I was there inside the CNN campus, given that the mammoth central building which

hoarded the red lettered CNN in bold, on the apex of it, multiplied my excitement within exponentially. From the entry point of the campus, I was accompanied with a couple of police escorts who navigated me to CNN's Security check gate, such that the breeze kept on accompanying me all this time whilst we continued moving towards the check gate corridor. Eventually, on reaching the security gate, I adjusted my hair strands precisely beside my ear lobes and knotted them in one place. The security folks checked me up for any offensive objects inside, where, at the same time I pulled on my coat over the chiffon designer white suit that added more up to my 'being corporate and smart' look. The security folks were soon satisfied with my belongings and hence provided me access with a blue laced company pass badge that connected across my neck which virtually gave me the identity of a CNN representative, which was just as analogous as you get to see those news channel correspondents on your TV sets.

Sooner to that, my tiny-silvery dialed wrist watch indicated half past eight as I entered the CNN's central studio hall where I met Bijan, a tall, lanky Indian fellow, one of CNN's International Division Staff, who came along dressed with a neat and classic formal attire. The hallway was a buzz of lights in and square every inch as I beheld the hall around, in a quick glimpse. However, my poor eyes could not cover everything as Bijan snapped in too quickly to welcome me upstairs.

We both waved greetings to each other as Bijan guided me upstairs to the news center area of CNN where all the buzz of the world cooks 24*7. For a moment, being a debutant inside one of world's largest news centers, I was stunned to see the energy of people inside, as every one of them

present on the floor were on to something productive and speaking at tandem.

It seemed to me as if my childhood dream of getting access into a television set has come true, and inside of which I was travelling across and beyond time. It is so amazing to see that there is news everywhere inside the center, right from the past, present and the future, there are thousands of monitors installed which displayed news at the same time, voices echoed as cacophony of the speakers fluctuated every now and then, where beautiful dazzling light shades on different corners of the floor made it even more sparkling to the eyes. Literally, there was so much for the eyes to capture and so little time.

Sooner then, the support staff working on this Indian Independence Day Project shifted me to a cabin where they gave me access to a computer on which I was scheduled to translate for the PMO India I-Day Speech, where, at the same time I was provided with a temporary CNN Login Credential to register myself into their system.

And finally, in the next ten minutes it was then the morning of **15th August 09:30 HRS** in India as my clock showed 11 PM EST, where the PM Shri Narendra Modi, with his usual graceful gesture was all set to address the Nation with his speech on India's 70th Anniversary of Independence. With a tint of nervousness initially within, I started off with my translation task as the Prime Minister sprinted off with his speech covering across various topics that mainly emphasized on technological advancement, agricultural development, national defense, socio-economic welfare and other related future goals of India.

The speech continued for around couple of hours



as I successfully completed mapping the PM's speech into English. The speech was put to an end finally, as the National Anthem of India buzzed up, such that, with the tunes of "Jana Gana Mana" flourishing in incessantly, made almost everyone in the center stand up to recognize this 70th event of freedom for India.

Sooner then, I was escorted back to the parking lot, few last-minute selfies for the social network feed, such that whilst returning, I quickly pushed down a few Whatsapp 'thank you' texts to those in my family and friends who believed in and supported me all throughout this event. You people mean to me a lot, and thus I came up successful. The event ended brilliantly. Trust me!!

Well, this was it, my experience at CNN translating the Indian Prime Minister's I-Day speech as freedom turned 70 this year. I believe, freedom is a choice, freedom is a bliss or more deeply, freedom is a spiritual spark in the mind that never gets old with its anniversaries every year and so as my India, '*Yeh Mera India, I love my India*'. With this patriotic flow of words here, I am sure you

too now would be humming the interludes of this song from Subhash Ghai's *Pardes*, isn't it?

Although as an auxiliary replacement to Mr. Ismail Charania, I cannot thank him enough for this and at the same time I feel honored to have found this opportunity at this point of my life. And albeit being humble by nature, I feel independently proud today for having myself successfully completed this task, which I was assigned with.

One thing that I would like to share as a moral over this entire CNN translation experience of mine, is that, "the people whom I met in CNN, are really amazing, right from the entry gate police escorts, Bijan and the support staff. They believe in appreciating people for their good deeds, may it be anything, and it is for people like them who know how to appreciate others, the desire for doing better things in us strengthens more, and so is my case today. I am morally boosted with a brand new positive vibe within, which would keep me doing things that I love to!! And that is my oath to myself on *India's 70th Anniversary of Freedom*."

Jai Hind!





Artwork by: *Aarin Thakurta* (age 6)



মেঘলেন

রিনা দত্ত চক্রবর্তী

উনিশশো শতাব্দীর শেষে বা বলতে পারেন বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় কলকাতা নিবাসী বাঙালিদের হাওয়া বদলের জন্যে পশ্চিমের দিকে পাড়ি দেওয়া ছিল রীতিভুক্ত। তখন অফিস আজকালকার মতন রেসের ময়দান হয়ে ওঠেনি, বোধহয় বা স্কুল-কলেজেরও এত হস্তিত্ব ছিল না। তাই ছুটি হলেই বা ঘরে বসে দম আটকালেই বাঙালি ছুটতো বেড়াতে। না ঠিক দেশভ্রমণ নয়, নির্ভেজাল আলস্যের সন্ধানে। উত্তর কলকাতার কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের বাসিন্দা গর্ডন বসুও এদেরই একজন।

আসল নাম *Sarojendra Nath Bose*। সাহেবের অফিসে

কাজ করে বা তাদের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের খাতিরেই বোধহয় নতুন নামখানি। সংসারে লোক প্রচুর। দুই পুত্র ও তাদের পরিবার ছাড়াও আছে বহু স্থায়ী-অস্থায়ী অধিবাসী। আর আছে বাড়ি ভর্তি পশু-পাখী। বাগানে ময়ূর ও হরিণ। বারান্দায় ম্যাকাও, কাকাতুয়া, ইত্যাদি সার সার খাঁচায় পাখি। ঝমঝম শব্দ তুলে ঘুরে বেড়ায় শজারু। তবু যেন মন ভরে না। তাই থেকে থেকেই ছুটে চলেন মধুপুরের বাগানবাড়িতে।

বাড়ির নাম মেঘলেন। না না আসলে কথাটা কিন্তু *May-Glen*। কোন এক ব্রিটিশ আমলের বাড়ি। দোতলা। নিচে

রান্নাঘর-বসার ঘর ছাড়া আর তিন-চারটি ঘর। লোক এলে ছিল ঢালা বিছানা পাতা। কুয়ো থেকে জল তুলে বালতি বালতি জল যেত বাথরুমে। চকচকে কাঁসা-পেতলের বাসনে খাওয়া দাওয়া আর পাথরের গেলাসে গরম চা। ওপরের ঘরটি শুধুমাত্র কর্তার। সেখানে অন্য কারুর থাকার নিয়ম নেই। খোলা ছাদে একখানি আরামকেদারায় শুয়ে থাকতেন তিনি। পশ্চিমের খোলা হাওয়ায় ভেসে আসে গোলাপের গন্ধ। সোমরা মালি খাঁটি হিন্দুস্তানী ভাষায় বাবুর তত্ত্বাবধানে লাগিয়েছে সারি সারি গোলাপের গাছ। এক-একটি গোলাপের একেকটি রূপ, মনমাতানো রঙে বাড়িটা যেন সদাপ্রফুল্ল। ঠিক তেমনি আছে আমবাগান, জামবাগান বাড়ির পেছনে। আছে ব্যাডমিন্টন কোর্ট, দোলনা, ক্রিকেটের টেন্ট। শহরের থেকে দূরে প্রকৃতির বুকো দু-দণ্ড স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন গুরুগম্ভীর বোসবাবু। ডজন খানেক নাতি-নাতনিদের কাছে ইনি দাদামনি। তাই এঁকে আমরা চলুন দাদামনি নামেই ডাকি।

সকালে উঠেই মাথায় টুপি আর হাতে লাঠি নিয়ে দাদামনি ঘোরেন সোমরা মালির পিছু পিছু। নিজের মনেই সময় কেটে যায়। তবে সে আর কতদিন। থেকে থেকেই খেপে খেপে আসে অতিথির দল। কেউ নিকট-আত্মীয় বা কেউ বা দূরের। কেউ বা চলে আসে বন্ধুত্বের সম্পর্কে। আসলে তখন ছিল না আজকের মতন প্রবল আপন পর জ্ঞান। বাড়িতে লোক এলে বিরক্তও হত না কেউ। ছিল না আপ্যায়নের বিড়ম্বনা। তাই বিকেলের ট্রেনে যে কেউ আসবে এই ভেবে একাগ্রাঙি স্টেশনেই দাঁড়িয়ে থাকত। যারা আগে এসে যেত তার পরের দিন স্টেশনে তারাও আবার পৌঁছে যেত আজ কে এল বা কোন বাড়িতে লোক এল দেখতে। বাড়ির আর সকলের মতই দূরের অতিথিদের জন্যেও ছিল একই ব্যবস্থা। না বেশি, না কম। তাই বোধহয় একবার যে আসতো সে আবারও আসতে চাইত।

এই অজপাড়াগাঁয়ে বিনোদন আর কয়টি! এই টাঙ্গায় চড়ে স্টেশনে আসা। কে এল, কে গেল খবরাখবর নেওয়া। ফেরার পথে হাটে থামা। রাতের মুরগি কিনে বাবুটির হাতে দিলেই সে মারত ছুট! বাবুরা বাড়িতে ফেরার আগেই রাতের রান্না তার চড়াতেই হবে যে। আর ততক্ষণে টাঙ্গা ছেড়ে সবাই নেমে পড়ে হাটে, বাড়ির ছোট ছেলে মেয়েগুলো কেনে মাটির খেলনা, কাঠের ঘোড়া, ওড়াবে

বলে ঘুড়ি। আর ছিল পেতল আর মাটির রান্না-বাসন। ছোট্ট খুস্তি, কড়াই, হাতা, এমনকি সবজি কাটার বাঁটিও। আর বাড়ির মেয়েরা বসে পড়ে চুড়িওয়ালার সামনে। হাত ভর্তি করে তারা পরে নানা রঙের কাঁচের চুড়ি। বাবুরা কিনতেন বর্ধমান মিষ্টান্ন ভান্ডার থেকে রোজকার মিষ্টি। তারপর গল্প করতে করতে এপাড়া ওপাড়া বেড়িয়ে সন্ধে নামার আগে বাড়ি ফেরত।

কখনো বা স্টেশন না গিয়ে সবাই বেরিয়ে পড়ত নাম-না-জানা ছোট্ট একটা পাহাড়ি ঝর্ণার দিকে। ঝর্ণার জল বয়ে যায় নুড়িপাথরের ওপর দিয়ে। স্বচ্ছ জলে আলো পড়ে নানা রঙের নুড়িগুলো যেন হেসে ওঠে। ঝর্ণার জল এতই কম যে কেবল মাত্র পায়ের পাতাটুকুই ভেজে। নদীর ধারে কখনো বা ক্রিকেট কখনো বা মেমোরি-গেম। সঙ্গে করে নিয়ে আসা মুড়ি মাখা আর গরম গরম তেলেভাজা। কত গল্প, কত গান। ছোট্ট নদীতট ভেসে যায় ছোট্ট ছোট্ট আনন্দের জোয়ারে। কখনো বা যাওয়া হত পাশের বাড়ির বাগানে। মে-প্লেন এর পাশে খানিকটা দূরেই ছিল দাদামনির এক ভগ্নীপতির বাগানবাড়ি। নাম মার্বেল-হল। বাড়ির কর্তারা যেমন আত্মীয়তায় বাঁধা, বাড়িদুটোর মালিরাও তাই। তাই যাতায়াত ছিল সর্বদাই। এবাড়ির গাছে আতা পাড়তে আসতো ওবাড়ির ছেলেমেয়েরা আর ওবাড়ির মিষ্টি পেয়ারার গাছের পানে ছুটত এবাড়ির কচিকাঁচার।

গ্রামের দিকে লোডশেডিং এমন ছিল যে অন্ধকার হবার আগেই ঘরে ঘরে পৌঁছে যেত হ্যারিকেন আর মোমবাতি। খাবার আগের সময়টুকু কেটে যেত তাদের পিঠ গুনে, লুডোর ছক্কার উল্লাসে আর অভুতুড়ে-আজগুবি সব গল্পে। সামনের একটি বাড়িতে থাকত ঘনশ্যাম বলে একটি ওখানকারই ছেলে। এদিকের বাড়িতে লোক এসেছে শুনলেই সে জানলার খড়খড়িতে ঢিল মারত। সেই আওয়াজ শুনে ঢালা বিছানায় নিদ্রামগ্ন গুরুজনদের পাশ কাটিয়ে বাচ্চারা বেরিয়ে যেত খেলতে। বছর আটকে ঘনশ্যামের বসন্ত রোগ হয়। সে সময় বসন্ত রোগ ছিল মারাত্মক। তেমন চিকিৎসাও কিছু ছিল না। ঘনশ্যামের মৃত্যুর পরও দুপুরবেলায় খড়খড়িতে যেন ঢিল পড়ার শব্দ পাওয়া যেত। আর আশেপাশের বাড়ির ভূতের গল্পের তো শেষ ছিল না। নড়াইল হাউস বলে একটি বাড়ির কেয়ারটেকার ছিলেন যে ভদ্রলোক, তাঁর গালে ছিল স্পষ্ট পাঁচ-আঙুলের দাগ।

তাঁর দাবি ছিল ভূতে চড় মেরেছে বলে অমন দাগ। আসল কারণটা হয়তো জড়ুল। কিন্তু হ্যারিকেনের আলোয় এইসব ভৌতিক গল্পের শ্রোতাই বেশি।

রাত আটটার সময়ে মুরগির ঝোল আর গরম গরম হাতে গড়া রুটি। মেনুর কোনো বৈচিত্র্য ছিল না। সেই সময়ে খুব ডাকাত পড়ত আর ডাকাতের ভয়ও ছিল প্রবল। তাই রাতে ঘুমোতে যাবার আগে ছিল ব্ল্যাক-ফায়ার করার রেওয়াজ। নিস্তব্ধতা ভেঙে বন্দুকের শব্দ ভেসে আসত চারিদিক থেকে। প্রত্যুত্তরে এ বাড়ি থেকেও ছোঁড়া হ'ত বন্দুক। রাতে শোনা যেত ঝাঁঝিপোকাকার গুঞ্জন আর চৌকিদারের হাঁক। লাঠি ঠুকে ঠুকে সে পাহারা দিত আর থেকে থেকে ডাক ছাড়ত - সোমরা মালি হোওওও? আর আধঘুমন্ত সোমরা উত্তর দিত হোওওও। এই রোজনামচার মাঝে ব্যতিক্রম হত না বিশেষ। তবু বার বার সদলবলে হেঁহে করতে আসার লোকের অভাব ছিল না। বোধহয় অল্পের আনন্দটা তখন হারিয়ে যায়নি।

এর মাঝে মধুপুরে ছুটি কাটাতে এলেন বাংলা চলচ্চিত্রের এক তারকা। স্টেশনে নাবার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই খবর ছড়িয়ে গেলো দিকে দিকে। সব বাড়িতে বায়না উঠলো দেখতে যাব, আলাপ করব। শোনামাত্রই নাকচ করে দিলেন দাদামনি। এ কি কথা। বাড়ির মেয়েরা-বৌয়েরা এখন সিনেমা স্টার দেখতে যাবে। কিন্তু এ আগুন নেভানো তার সাধ্যের বাইরে বলেই প্রমাণিত হল। বাড়ির গিন্নিরা লজ্জা চাপতে নির্বিকার থাকলেও ছেলেমানুষ বউয়েদের সঙ্গে নিয়ে ছোটরা বেরিয়ে পড়লো পরের দিন সকালেই। চিত্রতারকা তখন স্ত্রীলের সঙ্গে ব্যাডমিন্টন খেলছেন। টাঙ্গা একবার রাস্তার এ-মোড় থেকে ও-মোড় ঘুরে ঘুরে হারানো। কিন্তু বকুনি আর উৎসাহের আতিশয্যে বেচারী টাঙ্গাওয়ালা গামছায় ঘাম মোছে। শেষে গেট খুলে বেরিয়ে এলেন চিত্রতারকা নিজেই। বললেন আপনারা বরঞ্চ ভেতরেই আসুন। বসিয়ে নিজে হাতে কিনে আনা মিষ্টি খাওয়ানোতে আনন্দের যে প্রবল বন্যা বইল তা বলাই বাহুল্য।

শেষ বয়েসে বছরের বেশির ভাগটাই দাদামনি কাটাতেন এই বাড়িটিতে। বাগান নিয়েই কাটিয়ে দিতেন সময়। সেই সময়ের স্রোতে যখন তিনি হারিয়ে গেলেন; আস্তে আস্তে হারিয়ে যেতে লাগল এই বাড়িটিও। তার পরের প্রজন্মের বাড়ির আনন্দের ওপর টান থাকলেও বাড়ির পেছনে দেয়ার

মতন সময় বোধহয় বা ছিল না। আসলে আস্তে আস্তে দেশটা বদলে যাচ্ছিল। দেশ স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেল আরো অনেক কিছু; এতদিন কলকাতায় বসে দেশের জমিদারির ওপর নির্ভর করা কলকাতার বাবু সম্প্রদায় এখন অফিস পাড়ায় ছোটো। তাই এতো ছুটিছাটাও তাদের আর রইল না। আস্তে আস্তে এক্সপ্যাংগাডি আর স্টেশনে অপেক্ষায় থাকত না। আস্তে আস্তে টাঙ্গা গাড়িও আর রইল না। বাড়িটা বেশিরভাগ সময় খালি পড়ে রইল। তাই রাতে বন্দুকের শব্দও আর এলো না যখন, তখন শুরু হলো লুট। ঠেকাবেই বা কে?

দাদামনির মতন বাড়িটাও আজ তেলছবিতে বেঁচে আছে। শুনেছি এখন নাকি সেখানে হয়েছে বাড়ির কারখানা। সেও তিরিশ বছর আগের কথা। কে জানে স্কটল্যান্ডের সেই সবুজ উপত্যকা স্মরণে মধুপুরের মে-গ্লেন আদৌ আর আছে কিনা। বাড়িটা হারিয়ে গিয়েও হয়ত আরো কিছু বছর বেশ থাকবে আমাদের গল্পকথায়। হারিয়ে গেছে আনন্দটুকু। মলের আর শপিং সেন্টারের ভিড়ে হারিয়ে গেছে বাংলার হাট। বিদেশ ভ্রমণ আর সেলফি-স্টিকের ঠেলায় ঐ ছোট্ট বর্ণার জল আজ অবহেলিত। ইলেকট্রনিক যন্ত্রের মধ্যে ডুবে থাকা আমাদের ছেলেমেয়েরাও ঘুড়ি আর রান্না-বাটি কোনোদিন চিনল না আমাদেরই ভুলে। কারুর বাড়িতে না বলে ছুটি কাটানো এখন দূরের কথা। আসতে গেলেও ফোন করে, সময় নিয়ে তবে না এক কাপ চা। আমাদের পুরোনো থেকে নতুন আর উন্নতির পথে অনেক যেমন আমরা পেয়েছি, হারিয়েছি বোধহয় বিস্তর।



My Name in the American World

Raka Chakraborty
Grade 9, Northview High School

In third grade, my biggest challenge was cursive. No, not the technicalities of how to write the lowercase letter z or f, but instead being able to fit my full name on a line of the infamous wide notebook paper. Raka Chakraborty – Bet you’ve never heard that one before. Writing my name is one thing but pronouncing it is a whole other ballgame. You would think four letters, two of them being vowels, is a simplistic affair. However countless substitute teachers later, I can guarantee it’s not. I have heard every version in the book, from ‘Rake-a’ to ‘Rocky’ or ‘Raquel’. I don’t know where the imaginary letter e comes from, but everyone (except me) seems to see it. Even through the various failed attempts at saying my name, its meaning has not been tainted. Most Indian names have a meaning derived from ancient Indian languages. Names regarding the moon are a tradition through generations of my family, going all the way back to my great grandmother. Both my great grandmother’s name and my mother’s name mean moon. My name is a bit more specific, it means full moon.

There’s a great deal of history surrounding my last name. Interestingly, I didn’t know much about it until this writing assignment. My parents take great pride in our last name as it signifies education and class. Regardless of how saturated my name is in history, majority of people only seem to see an impossibly long string of letters.

To strangers, my first name still seems like a manageable challenge; however my last name will forever remain a work in progress. People of all ages struggle with the seemingly terrifying eleven-letter ordeal. Of course, it may be a hassle having to repeat my name over and over again yet, I have mastered the expertise needed to explain the pronunciation of my last name. The credit, however, goes to my mother. In kindergarten, my mom would frequently volunteer as a classroom reader. Once every two months or so she would come to my classroom with a couple of children’s books and read to us. The first time my mother came, my teacher introduced her as ‘Mrs. C’. My mom then politely stopped the teacher and corrected her saying “Mrs. Chakraborty - it’s not too difficult. It’s pronounced Chalk (like what is used to draw on sidewalks) – Row (like rowing a boat) – Boar (like a pig) – and Tea (like the drink).” She made the class repeat after her and at that time I was slightly embarrassed. Ironically, now I have adopted that very method and it works without a hitch.

Thankfully, my parents didn’t decide on a middle name, making formal papers significantly easier to fill out. They did however agree on a nickname which I use at home. Raka Chakraborty may be the name printed on my birth certificate but my other name is just as special and has an equal impact on my identity. It holds a place very near



and dear to my heart, meaning I will not share it easily. Only my family and close family friends call me by it as I wouldn't want it to tarnish from overuse. They both hold value in my eyes but as far as I know, this special name of mine will never fill in the forms on a standardized test.

In the end, no matter how many times I have

to politely correct someone when they say my name, I'm grateful to not be known as 'the tall Susan' or 'the Emma with brown hair'. I enjoy not being confused with any other person in my class, grade or even school. I appreciate being unique and having an unforgettable name. I'd rather continuously tell people how to say it rather than change my name or who I am.



Artwork by: *Sophie Priya Williams (age 11)*



Maa Durga is the mother of the Universe. She protects us from all evils. Durga Maa is very generous and showers blessings to all her devotees. Durga puja is a fun filled festival and I wait for it every year.

Sketch by: *Anushka Chowdhury*

Past Executive Committee

Year	President	Vice President	Secretary/Jt. Secretaries	Treasurer
2016	Parimal Majumder	Arindam Tapaswi Ayan Banerjee Kishore Chakraborty		Manas Chatterjee
2015	Munmun Sen	Mala Basu Parimal Majumder Arup Dhar	Anshuman Guin	Dipankar Roy
2014	Sonjukta Halder	Mousumi Karanje Mausumi Basu	Reshmi Mukherjee	Sudipta Ray
2013	Monamee Adhikari / Sumit Dutta	Partho Banerjee		Sudip Kundu
2012	Abir Guha Thakurta	Avro Deb Shankar Sengupta	Ashoke Sarker	Subroto Majumdar
2011	Joy Bhattacharjee	Dharmajyoti Bhaumik Krishnendu Das	Monamee Ghosal	Bhaskar Mitra
2010	Achintya Dey	Ashima Das Sumit Dutta	Kaushik Basu	Debatirtha Basu
2009	Priyabrata Dutta	Debasree Chatterjee-Dawn Saswati Banerjee	Joyita Bagchi Hedge	Subhankar Mukherjee
2008	Rabindra Chakraborty	Papiya Dutta	Mousumi Karanje	Shubu Mitra
2007	Dibyendu De	Shanta Gupta	Ranjita Betarbet	Umasankar Mondal
2006	Kiriti Gupta	Abir Mullick Anil Chakraborty	Dibyendu Dey	
2005	Mamata Paul	Sabari Roy	Premananda Goswami	Soumen Ghosh
2004	Partho Mukherjee (Jr.)	Mamata Paul	Maitree Sarkar	Sandip Dutta
2003	Shankar Sengupta	Amalendu Sarkar	Raja Gautam Kar	Sanghamitra Saha Surajit Roy
2002	Raktim Sen	Soumitra Chattopadhyay	Sabari Roy	Arunava Saha
2001	Amiya Ray Chaudhuri	Mridul Kumar Paul	Amlan Mojumdar	Surajit Roy
2000	Debashis Bhattacharya (partial term served)	Raja Goutam Kar	Working Committee: Sumitra Bhattacharya Shubhra Nag	Timir Pandit
1999	Nita Bose	Shubhra Nag Maya Biswas	Ashoke Sarkar Madhumita Chatterjee Chaitali Chatterjee Anjali Roy	Sharmila Chatterjee Sathi Karan
1998	Sreeparna Roy	Sanjukta Halder	Lekha Mukherjee Sabitri Pal	Rajashree Jena
1997	Shailendra Banerjee		Rajashree Jena Saibal Ghosal Gouri Banerjee	Timir Pandit
1996	Ashoke Bhattacharya		Sanjoy Maity	Joydip Bandyopadhyay
1995	Manoj Chakraborty			Ashoke Sarkar
1994	Monica Mukherjee		Anjali Roy	Alpana Poddar
1993	Shrimita Ray Chaudhuri		Sumitra Bhattacharya	Manoj Chakraborty
1992	Shubhra Nag		Kasturi Talukdar	Nirmal Das
1991	Kaberi Basu		Partha Bhattacharya	Gautam Goswami
1990	Sumitra Bhattacharya		Uma Mukherjee	Anik Chakraborty
1989	Dipak Bagchi		Dipankar Sarkar	Anita Chakraborty
1988	Niranjan Talukdar		Sujan Mukherjee	Anjan Duttgupta
1987	Alak Biswas		Shrimita Ray Chaudhuri	Dipak Bagchi
1986	Ashim Dutta		Monica Mukherjee	Barun De
1985	Ranjan Duttgupta		Bula Gupta	Soumya Das
1984	Partha Mukherjee		Rabi Basu	Lali Derrick
1983	Samarendra Mitra		Niranjan Talukdar	Samir Mitra Lali Derrick
1982	Sabyasachi Gupta	Alak Biswas	Ashim Roy	Priya Das
1981	Bijan Das		Samarendra Mitra	Partha Mukherjee Pranab Lahiri
1980	Mohit Sen	Sumitra Bhattacharya	Jayanta Bhattacharya	Ashim Dutta
1979	Jayanta Bhattacharya		Partha Mukherjee	

আবদ শুভেচ্ছা



DURGA PUJA - 2017
BENGALI ASSOCIATION OF GREATER ATLANTA